মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-১২

জানুয়ারি ২০১৬ ইং, রবিউস সানী ১৪৩৭ হি., পৌষ ১৪২২ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ربيع الثانى ١٤٣٧ھ يناير ٢٠١٦م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.............................. ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৩..... ৪

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৬

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
উস্তাদের দু'আ সফলতার পাথেয়........................ ৭

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
লা-মাযহাবী ফিতনা ও কিছু কথা-২.................... ৯
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

স্থানীয় ভাষায় জুমু'আর খুতবা : শরীয়ত কী বলে?... ১৯
মুফতী মুহাম্মাদ শফী কাসেমী

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৩....... ২৫
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৯........৩০
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৪

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে

ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকাল :
একজন মহান সাধকের বিদায়..........................৩৭
মুফতী জামীল আহমদ দা.বা.

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন
দ্বীন ও মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরী.........................৪১
মাওলানা আসগার কাসেমী সাহারানপুরী

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন একজন
বহুমুখী জ্ঞান ও গুণের অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব........... ৪৩
মুফতী ছাঈদ আহমদ

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

‘ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত’

আল হামদু লিল্লাহ ছুম্মা আল হামদু লিল্লাহ। মোবারক মাস মাহে রবিউল আউয়ালের প্রারম্ভে ‘ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত’-এর দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) ছিলেন একজন বিশ্ববরেণ্য ফকীহ ও মুফতী। তাঁর মহামূল্যবান হায়াতের (১৯৫১-২০১৫) পুরোটাই অতিবাহিত হয়েছে ফিকহ ফাতওয়ার কাজে। অর্থাৎ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যার শরয়ী সমাধান এবং শরীয়তের সঠিক বিষয়টি মুসলমানদের সামনে পেশ করা। তাঁর অহর্নিশ এই মেহনত এখন এক বিশাল অধ্যায়। দুনিয়ার বিখ্যাত ফকীহ ও মুফতীগণের ব্যাপক ইলমী খেদমাত যেমন বিশাল বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে বড় বড় কিতাবাকারে প্রকাশিত হয়ে মুসলিম উম্মাহের জন্য শরীয়তসম্মত জীবন গঠনের পাথেয় হিসেবে বিদ্যমান, তেমনি হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নিজের দেওয়া এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ইস্যুকৃত ফাতওয়ার ভাণ্ডারও অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড।

দুনিয়াতে প্রচলিত ফিকহের বিভিন্ন গবেষণা তথা মাযহাবের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহী গবেষণাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য। কারণ তিনি যেমন ছিলেন সুবিন্যস্ত আকারে ফিকহের প্রবর্তক, আবার তাঁর এই গবেষণায় ছিল যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুহাদ্দিস ইমামদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বড় আকারের ফিকহ বোর্ড, যা অন্যান্য মাযহাবের ক্ষেত্রে বিরল। সে কারণে আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক মুসলমান এই ফিকহের আলোকেই তাদের ইসলামী জীবন পরিচালনা করে। এমনকি, অনেকে ফিকহে হানাফীর বিরোধিতা করেও নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে দেখাতে সামর্থ্য হয়নি আজও।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)ও নিজের ফিকহী গবেষণাকে প্রশস্ত ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য বড় বড় মুফতীদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। যেকোনো ফাতওয়া অন্তত ডজনখানেক বড় বড় মুস্তানাদ মুফতীয়ানে কেরামের সত্যায়ন ছাড়া প্রকাশ করার অনুমতি দিতেন না তিনি। হযরতের জীবনের একটি বিশাল অংশ অতিবাহিত হয়েছে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায়। সেখানেও তাঁর তত্ত্বাবধানে অসংখ্য ফাতওয়া প্রকাশিত হয়েছে। জামিয়া পটিয়া থেকে পৃথক হওয়ার পর ঢাকাতে তিনি খুব ছোট আকারে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ নামে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন, যা আজ সারা দুনিয়ায় একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ও বিশ্রুত। এর অধীনে তিনি বরেণ্য মুফতীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন একটি কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ড। তিনি যাবতীয় ইস্তিফতার জবাব এই ইফতা বোর্ডের অধীনে প্রদান করতেন।

কোনো আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার সম্মুখীন হলে তার সমাধানের জন্য দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহের মুফতীয়ানে কেরাম এবং বরেণ্য আন্তর্জাতিক ফিকহী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সেমিনার আয়োজন করতেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ ফয়সালার ওপর তিনি ফাতওয়া প্রদান করতেন।

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে যে সকল ফাতওয়া প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে নির্বাচিত ফাতওয়াগুলোর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারেরও অধিক।

মারকায প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকে হযরতের ফাতওয়ার গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা অনুধাবন করে দেশ-বিদেশের উলামায়ে কেরাম এবং শিক্ষানুরাগী ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সব সময় পরামর্শ দিতেন হযরতের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ফাতওয়াগুলোকে একত্রিত করে একটি বড় আকারের সংকলন প্রকাশের। হযরতেরও এই ব্যাপারে খুব মনযোগ ছিল। তাই তিনি ফাতওয়ার কিতাবাকারে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে সময় থেকে। ইন্তেকালের কয়েক বছর পূর্বে হযরত এই ব্যাপারে চূড়ান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রীতিমতো এটিকে একটি প্রকল্পের রূপ দেন। এর জন্য পৃথকভাবে লাখো টাকার কিতাবাদির ব্যবস্থা করেন। স্বতন্ত্র লোক নিয়োগ দেন।

আলোচ্য ‘ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত’ নামে বাংলা ভাষায় অনন্য ফাতওয়ার কিতাবটি হযরতের দীর্ঘ হায়াতের সুবিশাল মেহনতের ফসল। কিতাবটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় আমি এবং মারকাযের ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলে আনন্দবোধ করছি এবং আল্লাহ তা’আলার অগণিত শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কিতাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য এবং অদ্বিতীয় একটি পূর্ণাঙ্গ ফাতওয়ার কিতাব হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রায় ১৫ খণ্ডের অধিক কিতাবটি যত দ্রুত প্রকাশ করা যায় এর জন্য আমি মারকাযের পক্ষ থেকে সকলের কাছে দু’আপ্রার্থী।

আরশাদ রাহমানী
ঢাকা।
২৯/১২/২০১৫

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (সূরা আরাফ ১৮৮)

এখানে প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডণ করা হয়েছে, যা তারা নবী রাসূলদের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছে। তাদের জ্ঞানও আল্লাহর মতই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছ কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদের হাতে। এই বিশ্বাসের দরুনই তারা রাসূলে করীম (সা.) এর নিকট কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ জানতে চাইত।

এই আয়াতে তাদের এরূপ শিরকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রাসূলগণই হোক শিরিক এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ তা'আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শিরিক। বস্তুত এই শিরকী বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোনো অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডণ করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূল (সা.) এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কোরআনে কারীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, ইলমে গায়েব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক।

এ আয়াতে মহানবী (সা.) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজে লাভ ক্ষতিরও মালিক নই– অন্যের লাভ ক্ষতি তো দূরের কথা।

এভাবে তিনি যেন এ কথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে গায়েব নই যে, যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়েবী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোনো একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোনো ক্ষতি আমার ধারে কাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনেটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রাসূলে কারীম (সা.) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখকষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (সা.) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি, সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সা.) আহত হন এবং মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সা.)- এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয়ত এই ছিল, যাতে মানুষের সামনে কার্যত এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী রাসূলরা আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকার। যেমন ইহুদী খৃস্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রাসূলদের সম্পর্কে আল্লাহর গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শিরক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এই আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী রাসূলগণ সর্বশক্তিমানও নন এবং ইলমে গায়েবেরও মালিক নন, বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়ে ছিলেন, যতটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোনো রকম সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশি। বিশেষ করে আমাদের রাসূলে কারীম (সা.)কে তাঁর পূর্ববর্তী পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত নবী রাসূলের যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়ে বহুগুণে বেশি জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে আজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রাসূলে কারীম (সা.) কে লক্ষ লক্ষ গায়েবী জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় ইলমে গায়েব বলা হয় না। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জ্ঞানকে ইলমে গায়েব বলা যেতে পারে না।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৩

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং-২৭ :

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ "فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب : أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ؟ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلاص الَّتِي أَلْزَمَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتِي أَلاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ :شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যদি কেউ হক্ব জেনে এখলাসের সাথে অন্তরের (দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে) তা পাঠ করে, তবে তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি কি বলব ওই কালেমাটি কী? তা ওই কালেমা, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপন রাসূল এবং তাঁর সাহাবীগণকে সম্মানিত করেছেন। তা ওই তাকওয়ার কালেমা, যার আকাঙ্ক্ষা রাসূল (সা.) আপন চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তাঁর নিকট হতে করেছিলেন-তা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়া। (মুসনাদে আহমদ ১/৪৯৯, হা. ৪৪৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০২, হা. ১২৯৮) হাদীসটির মান : হাসান

হাদীস নং-২৮ :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ " :لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ :أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي ,فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ :وَمَا مُحَمَّدٌ؟ وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ :تَبَارَكَ اسْمُكَ , لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ وَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَكَ مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ ,فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ :يَا آدَمُ ,وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ,إِنَّهُ لَآخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ,وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ

রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান, হযরত আদম (আ.) হতে যখন ওই কাজ সংঘটিত হলো (যার দরুন তাঁকে বেহেশত হতে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন হতে তিনি সর্বদা ক্রন্দন করতেন এবং দু'আ এস্তেগফার করতে থাকতেন) একবার আসমানের দিকে দেখে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.)-এর উসিলায় তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। ওহী নাজিল হলো, মুহাম্মদ (সা.) কে? (যাঁর উসিলায় ক্ষমা চাইলে) তিনি আরজ করলেন, যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন আমি আরশের ওপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিত দেখেছিলাম। তখন আমি বুঝেছিলাম যে মুহাম্মদ (সা.) হতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কেউ নেই। যাঁর নাম আপনি নিজের নামের সাথে রেখেছেন। ওহী অবতীর্ণ হলো যে তিনি সর্বশেষ নবী, তিনি তোমার আওলাদের মধ্য হতে, কিন্তু তিনি যদি না হতেন তবে তোমাকেও সৃষ্টি করা হতো না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২৫৩, হা. ১৩৯১৭, আল মুজামুস সাগীর ২/৮২, হা. ৯৬৬, দালাইলুন নবুওয়্যাহ ৫/৪৮৯, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৬৭২, হা. ৪২২৮)

হাদীসটি মওকুফ

ক.

হযরত বুরাইদাহ (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আ.)-এর ক্রন্দন যদি সমগ্র দুনিয়ার ক্রন্দনের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তাঁর ক্রন্দনই অধিক হবে।

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ :لَوْ كَانَ بُكَاءُ دَاوُدَ , وَبُكَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعًا يَعْدِلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَا عَدَلَ لَوْ أَنِ بُكَاءُ دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُكَاءُ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ، جَمِيعًا، يَعْدِلُ بِبُكَاءِ آدَمَ، مَا عَدَلَهُ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১০/৫০১, হা. ৮৩৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/১৭৮, হা. ১৩৭৪৯, তারীখে বাগদাদ ৪/৪৭, আল মু'জামুল আওসাত ১/৭২, হা. ১৪৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ.

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন এর দুই পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখতে পেলাম। প্রথম লাইনে ছিল :

لا إله إلا الله محمَّد رسول الله

দ্বিতীয় লাইনে ছিল :

ما قدمنا وجدنا، وما أكلنا ربحنا، وما خلفنا خسرنا"

অর্থাৎ, যা আগে পাঠিয়ে দিয়েছি (দান-খয়রাত করেছি) তা পেয়েছি। যা দুনিয়াতে খেয়েছি, তাতে লাভবান হয়েছি। আর যা রেখে এসেছি, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আর তৃতীয় লাইনে লেখা ছিল :

أمة مذنبة ورب غفور

অর্থাৎ উম্মত গোনাহগার আর আল্লাহ ক্ষমাশীল

عن انسؓ قال: لما عرج بى الى السماء دخلت الجنة فرأيت فى عارضتى الجنة مكتوبا ثلاثة أسطر بالذهب : السطر الأول" :لا إله إلا الله محمَّد رسول الله "والسطر الثانى " :ما قدمنا وجدنا، وما أكلنا ربحنا، وما خلفنا خسرنا "والسطر الثالث" :أمة مذنبة ورب غفور" الرافعى وابن النجار عن أنس.

(জামেউস সগীর ২/৮৭১ হা. ৪১৮৬, কানযুল উম্মাল ৪/২৫১, হা. ১০৩৯৫, তবকাতুস শাফিয়া ১/১৫০, হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্বী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

ইফতারের সময় দু'আর গুরুত্ব দেওয়া :
ইফতারের সময় বিশেষভাবে দু'আর পাবন্দি করা প্রয়োজন। নিজের জন্য এবং সকলের জন্য। বলুন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং সকল মুসলমানের যাবতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। খুব সংক্ষিপ্ত দু'আ। খুব কম সময়ই প্রয়োজন হয় এই দু'আতে। কিন্তু সকল মুসলমানের জন্য দু'আ এতে নিহিত রয়েছে। বলুন, আমাদের এবং সকল মুসলমানের হেফাজত করো। আমাদের এবং সকল মুসলমানের গোনাহ মাফ করো। মোটকথা, দু'আর মধ্যে নিজের সাথে অন্যদেরকেও সংশ্লিষ্ট করা উচিত।

অন্যকে অধম মনে করার আমার কি অধিকার?
নিজের ভালো কাজ তো সীমিত। অন্যের নেক কাজ সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। সুতরাং নিজেকে বড় মনে করার অধিকার কোথায়? হতে পারে অন্যের নেক কাজের পরিমাণ অনেক বেশি। এরূপ হয়েও থাকে। আমাদের একজন হেফজের উস্তাদ ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাঁর মাগফিরাত করুন। আমীন। এখান থেকে সামান্য দূরে একটি গ্রাম। যার নাম 'বাওয়ান'। বাওয়ান এই জন্য বলা হয় যে, সেখানে পানি খুব নিচে। প্রায় ৫২ হাত নিচে। গ্রামটি উঁচুতে অবস্থিত। সেখানকার কিছু কিছু ছেলে পড়ত তাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল। কোনো কোনো বৃহস্পতিবার সেখানে যেতেন। তিনি বলতেন, 'আমি যখন হারদূয়ী থেকে বড় হই তখন থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুরু করি। ওখানে পৌঁছতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এর মধ্যে আমি ১৫ পারা কোরআন তেলাওয়াত করে নেই। আবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আরো ১৫ পারা তেলাওয়াত করি।' আল্লাহ তা'আলার কিছু কিছু বান্দা আছেন, যাঁরা এরূপ অভ্যাস করে নেন। এসব বিষয় অন্যের জানা থাকে না। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) রমাজান মাসে দিনে এক খতম, রাতে এক খতম; আরেক খতম করতেন তারাবিহের মধ্যে। দেখুন কী অবস্থা। আল্লাহর বান্দাদের এরূপ অবস্থা। সেখানে নিজেকে বড় মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আসল বিষয় হলো নম্রতা। নিজেকে অধম মনে করো। নিজেকে অধম মনে করার এটি একটি মাপকাঠি।

আরেকটি মাপকাঠি :
অধম কে? অধম সেই ব্যক্তি, যার পাপ বেশি। বড় সেই ব্যক্তি, যার পাপ কম। অন্যের পাপ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। একটি-দুটি হয়তো জানা হয়ে থাকে। কিন্তু নিজের পাপ সম্পর্কে নিজে ভালোভাবেই জ্ঞাত। সুতরাং প্রত্যেকে নিজের পাপের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন নিজের পাপই বেশি। যেহেতু আমার নিজের পাপই বেশি, সেহেতু আমিই অধম। সুতরাং নিজেকেই অধম মনে করতে হবে।

মুক্তাদী নিজেকে অধম মনে করে :
মুক্তাদীগণ নিজেকে অধম মনে করে থাকে। তাই নামাযের ব্যাপারে মুক্তাদী আর ইমামের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ হয় না। হ্যাঁ, কোনো ভুল বা গলদ হয়ে গেলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু কোনো মুক্তাদী বলে না নামায আমি পড়াব।

নিজেকে বড় মনে করার কুফল :
যাদের মধ্যে এরূপ রোগ আছে, তাদের কী হয় দেখেন। এক মাদরাসায় কোনো আলেমকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কয়েক মাস পার করার পর ওই শিক্ষক দাবি উঠালেন, বর্তমানে যিনি মাদরাসার পরিচালক তাঁর ইলমী যোগ্যতা কম। আমার মধ্যে টাটকা ইলমী যোগ্যতা। সুতরাং আমাকেই পরিচালক বানানো হোক, অন্যথায় আমি ইস্তেফা দেব। তাঁর কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি হলো, তিনি আরবী সামান্য বেশি জানেন আর অন্যজন আরবী ভাষা একটু কম জানেন। অথচ উভয়জনই দাওরায়ে হাদীস ফারেগ। তিনি তাখাসসুস করেছেন, উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এটিকেই বড় হওয়ার মাপকাঠি মনে করেন। বড় আল্লামা হয়ে গেছেন বলে মনে করেন। আমি তো বলি, এরূপ লোক আইন দ্বারা লিখিত عـــلامـــه নন বরং এরূপ লোক আলিফ দ্বারা লিখিত الّامه।

নামায ও কোরআন তেলাওয়াতেও তাখাসসুস করা উচিত :
তাখাসসুস বলাতে স্মরণ এল, এক লোক এসে বললেন, আমি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমি বললাম সূরায়ে ওয়াল আদিয়াত তেলাওয়াত করুন। সূরায়ে ফলক এবং সূরায়ে নাস শোনান। তিনি শোনালেন। তাঁকে আমি বললাম, মাশাআল্লাহ আপনি তো তাখাসসুস ফিল ফিকহ করেছেন, নামাযের সূরাগুলোর তাখাসসুস করুন। তারপর বললাম–আচ্ছা, সূরায়ে ফাতেহাটা পড়ে শোনান। সূরায়ে ফাতেহাতে পাসের একটা নম্বর ছিল। তাতেও তিনি উচ্চ নম্বর অর্জন করেননি। তাই তাঁকে বললাম, সূরায়ে ফাতেহার তাখাসসুস করুন। এখন তো অনেকের ব্যাপারেই বলতে হয়–ভাই, তাখাসসুস ফিসসালাত করুন এবং সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়ুন।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

উস্তাদের দু'আ সফলতার পাথেয়

হযরত (রহ.) বলেন, যে ছাত্র উস্তাদদের সাথে পূর্ণ আদব বজায় রাখবে, সদাচরণ করবে, আনুগত্য থাকবে, তাঁদের দু'আ নেবে–সে অবশ্যই সফল হবে। কিতাব বুঝে আসুক বা নাই আসুক আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতে তার থেকে দ্বীনি খেদমত নেবেন।

বলেন, আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতেছি, বর্তমানে দেশে বড় বড় বয়োবৃদ্ধ যত আলেমে দ্বীন আছেন, বয়সে সবাই আমার ছোট হবে দু-চারজন ছাড়া। যেমন–শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব দা.বা. (ঢাকা), মুফতী আহমদুল হক সাহেব দা.বা. (হাটহাজারী), মাওলানা ইসহাক গাজী সাহেব (দা.বা) পটিয়া। এই তিনজন মনীষী বয়সের দিক থেকে আমার বড়। তাঁদের ছাড়া আমার চেয়ে বয়সে বড় আরো দু-একজন পাওয়া গেলে যেতেও পারে। অন্য সবাই বয়সে আমার সমকালীন হবেন, নয়তো ছোট হবেন। এ কারণেই আমি আমার অভিজ্ঞতা বেশি হওয়ার দাবি করতে পারি। এবার আমার অভিজ্ঞতার কথা শোনো–যখন আমি দারুল উলূম দেওবন্দে ফুনুন পড়ি তখন 'মোল্লা জালালাল' যে উস্তাদ পড়াতেন তাঁর দরস ছাত্রদের বুঝে আসত না। অনেক সময় মনে হতো সম্ভবত উস্তাদজিও বিষয়টি পুরোপুরি বোঝেননি। আরো ভাবতাম! আমি ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র উস্তাদদের দৃষ্টিতেও ভালো। আমারই যখন এই অবস্থা, তো অন্যদের কী হালত হবে? এভাবেই বছরটি কেটে যায় কখনো মুখে কিছু বলিনি আবার দরসও ফাঁকি দেয়নি। প্রথম সাময়িক ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা তো স্বয়ং উস্তাদে মুহতারাম নিতেন এবং মৌখিক নিতেন তাই পাস করা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষায় হলো কী? তা শোনো–এটা প্রসিদ্ধ ছিল যে দেওবন্দের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খুব কঠিন হয়। কিতাব যে উস্তাদ পড়ান তিনি পরীক্ষা নেন না, নেন অন্যজন। আবার পরীক্ষার হলেও কোনো উস্তাদ থাকেন না। অতএব প্রশ্ন বুঝে নেওয়ার সুযোগও নেই, এদিকে মোল্লা জালালের পরীক্ষার দিন চলে আসে, কী হবে ভেবে পাচ্ছি না? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় মুহতারাম উস্তাদের বাসায় গেলাম, তিনি দেখে তো মহাখুশি। সালাম বিনিময় করে বললেন, এসো এসো, হঠাৎ এলে কী ব্যাপার? আমি সবিনয় আরজ করলাম–হযরত! আগামীকাল 'মোল্লা জালাল' কিতাবের পরীক্ষা। আমার সাথে আরেকজন সঙ্গি ছিলেন, যিনি বর্তমানে পটিয়া মাদরাসার সিনিয়র একজন উস্তাদ। তিনি মাওলানা আনোয়ারুল আজীম সাহেব উস্তাদে মুহতারাম মোল্লা জালালের পরীক্ষার কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন–যাও যাও ভাই, আমি দু'আ করে দেব। আমরা ফিরে আসার পথ ধরলাম। তিনি আবার ডাকলেন–এদিকে এসো। আমরা গেলাম, তিনি বললেন–আগামীকাল ফিরনি রান্না করব তোমরা সকালে এসে ফিরনি খেয়ে যেও। এ কথা শুনে মহাবিপদে পড়লাম। কারণ পরীক্ষার দিন সকালের সময়টি একজন ছাত্রের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়টিতে কিতাবের বহু জায়গা দেখে নেওয়া যায়। এ সুযোগটিও হাতছাড়া হয়ে গেল। এবার দুই সঙ্গী পরামর্শ করলাম–যার যার সময় মতো সে আসবে। পরের দিন সকালে আমি উস্তাদের বাসায় গেলাম। তবে আমার অপর সঙ্গী এলেন না। মুহতারাম উস্তাদ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গী কোথায়? বললাম, হযরত কথা হয়েছিল যার যার সুযোগ মতো আসার। বললেন, ঠিক আছে তুমি খেয়ে নাও, সে যখন আসবে, তখন খাবে। আমি খেলাম ঠিকই; কিন্তু পরীক্ষার চিন্তায় কোনো স্বাদই অনুভব করিনি। সবশেষে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করি। প্রশ্ন পত্র হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে উর্দূ ভাষায় কিছু লেখি। এক ঘণ্টার পূর্বে উত্তরপত্র জমা করা নিষিদ্ধ হওয়ায় উর্দূ লেখাগুলোর আরবী অনুবাদ করি। এক ঘণ্টা পার হলে পরচা জমা করে হল থেকে বের হয়ে যাই। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

হলে দেখতে পেলাম মোল্লা জালালে আমাকে ৫২ (বায়ান্ন) নম্বর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, তখন ৫০ (পঞ্চাশ) নম্বরের পরীক্ষা হতো। তাই মোল্লা জালালের ৫২ নম্বর দেখে আমি হতবাক হলাম এবং ভাবলাম এটা মুহাররিরের ভুল! নম্বর ৫২ হবে না, হবে ২৫ (পঁচিশ)। ভুলে ২-এর জায়গায় ৫- সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভেবে আমি দপ্তরে তালীমাতে গিয়ে বললাম–মুন্সীজি, আমাকে মোল্লা জালালে ভুল নম্বর দেওয়া হয়েছে ২৫-এর স্থলে ৫২ দেওয়া হয়েছে। এ কথা বলার কারণ, আমার তো ভালোভাবেই জানা ছিল আমি পরীক্ষায় কী লিখেছি! কত নম্বর পাব! সাথে সাথে মুন্সীজি রেজিস্টার খুলে দেখালেন–এই যে দেখো, এখানে আব্দুর রহমান চাটগামীকে ৫২ নম্বরই দেওয়া হয়েছে। আর এই যে দেখো, পরীক্ষকের পরচায়ও ৫২ নম্বরই লেখা রয়েছে।

হযরত (রহ.) বলেন–আরে ভাই, এ তো গেল দেওবন্দের ঘটনা দেশের ঘটনাও শুনে নাও–আমি নাজিরহাট মাদরাসায় যখন শরহে তাহযীব কিতাব পড়ি কিছুই বুঝিনি, তাই পরীক্ষার দিন ভেগে গেলাম। বড়ভাই মরহুম উবায়দুর রহমান সাহেব (রহ.) ধরে নিয়ে এলেন। পরীক্ষক আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি খুব সুন্দরভাবে মতন পড়ে শোনালাম। এবার মতলব/মর্ম জিজ্ঞাসা করলে বললাম, আমি জানি না। আল্লাহর শোকর ফারেগ হওয়ার পর আমাকে শরহে তাহযীব কিতাবখানাই পড়াতে দেওয়া হয়। আলহামদু লিল্লাহ কিতাবটি সুন্দরভাবেই পড়াতে সক্ষম হই। শুধু তাই নয়, ইলমে মানতেক ফলসাফা আমার নিকট সহজবোধ্য এবং স্বভাবজাত ফনে পরিণত হয়। জানো! এটা কেন হয়েছে? শুধুমাত্র উস্তাদদের দু'আর বরকতে! বেশি পড়লে-পড়ালেই মানুষের উন্নতি সাধিত হয় না। বরং উস্তাদদের দু'আই মূল কারিগর। পরিশ্রমে যা হয় না, দু'আ দ্বারা তা হয়। হযরত আরশাফ আলী থানভী (রহ.) সুন্দর বলেছেন,

بنی اندر خود علوم انبیاء
بے کتاب و بے معین اوستاں

কিতাবপত্র ও কারো সহযোগিতা ছাড়াই তুমি নিজের মধ্যে নববী ইলম উৎসারিত হতে দেখবে যখন তোমার প্রতি কোনো আল্লাহওয়ালার সুনজর ও দু'আ থাকে।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

লা-মাযহাবী ফিতনা ও কিছু কথা-২

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

আল্লাহ তা'আলা নিজেই কিয়াস করার হুকুম দিয়েছেন فاعتبروا يا أولى الأبصار (সূরা হাশর ২), এর চেয়ে আরো স্পষ্ট কথা নবীজির হাদীসে এসেছে। হুজুর (সা.) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে পাঠানোর পূর্বে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে মুআয! তুমি মানুষের মাঝে কিভাবে ফয়সালা করবে?' (মদীনা থেকে ইয়েমেন দূরে হওয়ায় সব ফয়সালার জন্য মদীনায় আসা সম্ভবপর নয়) তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

"কোরআন থেকে ফয়সালা করব।"

"কোরআনে না পেলে কী করবে?"

"আমি আপনার হাদীসের মধ্যে, সুন্নাহর মধ্যে তালাশ করব।"

"হাদীস বা সুন্নাহয় নেই, তখন কী করবে?" মুআয ইবনে জাবাল বললেন, أجتهد برأئى তখন আমি কিয়াস করব।"

অর্থাৎ ওটা কোরআন-হাদীসে নেই, কিন্তু অনুরূপ আছে। অনুরূপ বের করে সেটা দিয়ে ফয়সালা দেব। এই কথা শুনে নবীজি রাগ হলেন, না খুশি হলেন? খুশি হলেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله بالحق তরজমা : "সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে সত্যে পৌঁছার তাওফীক দান করেছেন।"

কিয়াস করার কথা শুনে নবীজি খুশি হয়ে গেলেন।

এমন অনেক কিয়াস নবীজির সামনে হয়েছে। কিন্তু তিনি তো বলেননি যে "এটা শিরক! এটা শরীয়তের দলিল না।"

এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামগণ কি কিয়াস করেননি? করেছেন।

দুজন সাহাবী এক সফরে গেছেন, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে; কিন্তু পানি পাচ্ছিলেন না। উভয়েই তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলেন। নামায পড়া শেষ। এখন পানি পাওয়া গেল। কে বা কারা পানি নিয়ে এল। তো একজন সাহাবী পানি পাওয়ার কারণে ওজু করে দ্বিতীয়বার নামায পড়লেন। অন্যজন পড়লেন না। উনি বললেন, "নামায তো একবার পড়ে ফেলেছি, আমার ফরজ তো আদায় হয়ে গেছে।" তো উনি পানি পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার নামায পড়লেন না। সফর থেকে ফিরে এসে উভয় সাহাবী নবীজির কাছে এই রিপোর্ট পেশ করলেন। আমাদের নবীজি ওই সাহাবীকে (যিনি নামায পড়েননি) বললেন, أصبت السنة অর্থাৎ তুমি সুন্নাত অনুযায়ী করেছ। পড়েই যখন ফেলেছ আর পড়ার দরকার নেই। বরং পড়ার আগে যদি পাওয়া যেত বা পড়ার মাঝখানে যদি পানি পাওয়া যেত, তাহলে তোমাকে ওজু করতে হতো। পড়ার পরে যেহেতু পেয়েছ, এখন আর দরকার নেই। (আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৩৮) নবীজি তাঁকে সাপোর্ট করলেন। আর অপরজনকে বললেন, "তোমার কাজটি সঠিক হয়নি। সামনে খেয়াল রাখবে।"

তো দেখেন, তাদেরকে মাসআলা বলে দিলেন। কিন্তু এ কথা বললেন না যে, তোমরা কিয়াস করলে কেন? কিয়াস করা তো শিরক! নবীজি এটা বলেননি। আমরা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

তো শরীয়তের চার দলিলের এক দলিল হলো কোরআন। আর দ্বিতীয় দলিল হলো সুন্নাহ। আর তিন নম্বর দলিল হলো ইমামদের ঐকমত্য। এটাকে বলে اجماع (ইজমা)। ইজমার একটি উদাহরণ : আপনি আপনার ছেলের জন্য অসিয়ত করে গেছেন। বলুন! জায়েয হবে? আপনার ছেলে তো মীরাছ পাবে। আপনার থেকে আপনার ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট হারে মীরাছ পেয়ে থাকে। এর পরও আপনি আলাদা করে এক ছেলেকে আবার কিছু দিয়ে গেলেন কেন? 'মীরাছের বাইরে কিছু দেওয়াটাকে বলে "অসিয়ত"। তো ওয়ারিশদের জন্য এই অসিয়ত যে হারাম, এটা কিসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো? এটা "ইজমা'" দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। চার ইমামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার থেকে যে মীরাছ পাবে, তার জন্য আলাদা অসিয়ত করতে পারবে না।

আর চার নম্বর দলিল হলো "কিয়াস"। আর "কিয়াস"-এর অর্থ, যা পূর্বেই বলেছি যে, কোনো এমন বিষয়, যে বিষয়ে কোরআন-হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়নি। ওটা ইমামগণ কিয়াস করে বের করেন।

যেমন–আমি মদের ওপরে কিয়াস করে হেরোইনের কথা বললাম। ওটাকে বলে কিয়াস। যেকোনো বিষয়েই তো দলিল লাগবে। নয়তো আল্লাহ যে ঘোষণা করলেন, "আমি আজকের দিন তোমাদের জন্য ইসলামকে, আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" বিদায় হজে আরাফার দিন এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে :

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام دينا

অর্থাৎ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো।

তাহলে কোনো মাসআলা কি এমন আছে, শরীয়তে যার উত্তর নেই? অথবা কিয়ামত পর্যন্ত কি এমন কোনো মাসআলার উদ্ভাবন হতে পারে, যার কোনো উত্তর নেই? কত কিছু কিয়ামত পর্যন্ত নতুন আবিষ্কৃত হবে? বীমা হবে, শেয়ারবাজার হবে, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং হবে...। কিন্তু উলামায়ে কেরাম কি এগুলো জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ফাতওয়া দিচ্ছেন না? তো এগুলো তো নবী (সা.)-এর যুগে ছিল না। তাঁরা কোত্থেকে ফাতওয়া দেন? ওই কিয়াস থেকে, যা কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

রাসূলের যামানাতে কি টেলিভিশন ছিল? তো উলামায়ে কেরাম টেলিভিশন হারাম বলেন। কিসের ভিত্তিতে? কিয়াস করে। কোরআনে এমন কথা আছে, যার দ্বারা এটা হারাম হওয়া ক্লিয়ার বোঝা যায়। যেমন–একজন মহিলাকে বাস্তবে দেখা হারাম। তদ্রূপ তার ছবি দেখাও হারাম। এসব কি নেই টেলিভিশনে? আছে। গান-বাদ্য হারাম, টেলিভিশনে নেই? বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা হারাম। এটা কি টেলিভিশনে নেই? এসবের ভিত্তিতে টেলিভিশন হারাম বলা হয়।

তো আহলে হাদীস ভাইয়েরা এই চার দলিলের দুই দলিল (ইজমা, কিয়াস) মানে না। বুঝতে পারছেন, সমস্যাটি কোথায়?

দুই নম্বর কথা : নবীজির বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে ফকীহ বা ইমাম লাগবে। উম্মতের উলামাদের বিভিন্ন নাম আছে। এক গ্রুপ উলামার নাম হলো 'ক্বারী'। আরেক গ্রুপ উলামার নাম হলো 'হাফেজ' 'মাওলানা' 'মুহাদ্দিস' 'মুফতি' বিভিন্ন নাম আছে। এ রকম আরেক গ্রুপ উলামার নাম হলো 'ফকীহ'। বেশির ভাগ নাম আসে দুই গ্রুপের 'মুহাদ্দিস' এবং 'ফকীহ'। এই দুই গ্রুপের মাঝে পার্থক্য কী?

আপনারা কক্সবাজারের লোক, আপনারা সাগরের পাশের লোক। এই সাগর থেকে দুই প্রকার লোক ফায়দা উঠায়। এক প্রকার লোক হলো 'জেলে'। তারা উপরে থেকে মাছ ধরে আনে। ঠিক কি না? নাকি তারা পানির তলে চলে যায়? আরেক গ্রুপ লোক আছে, তারা বিশেষ পোশাক পরে অক্সিজেন সাথে নিয়ে সাগরের তলে চলে যায়। গিয়ে মণি-মুক্তা নিয়ে আসে। সাগর কিন্তু একটাই। কিন্তু কেউ উপকার নিচ্ছে উপর থেকে, আর কেউ উপকার নিচ্ছে তলদেশ থেকে। তো কোরআন-হাদীস তো একটা। এক গ্রুপ বাহাস করছে উপরেরটা নিয়ে, তাদেরকে বলা হয় "মুহাদ্দিস"। আর যাঁদের জ্ঞান আরো তীক্ষ্ণ, আরো গভীর; যাঁরা কোরআন-হাদীসের একদম গভীরে চলে যান, গিয়ে মণি-মুক্তা নিয়ে আসেন। জটিল মাসআলা ওখান থেকে 'হল' করে নিয়ে আসেন, তাঁদের নাম কী?

তাঁদের নাম 'ফকীহ', যার বহুবচন "ফুকাহা"। আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহ.), উনি একজন সর্বোচ্চ মানের ফকীহ ছিলেন। উনি যে চল্লিশজন শাগরিদ তৈরি করেছেন (আল্লাহু আকবার) একেকজন ইলমের সাগর! তাঁরা সকলেই ছিলেন ফকীহ। অবশ্য আমরা তাঁদেরকে 'ইমাম' বলে নামকরণ করে থাকি। 'ফকীহ আবু হানীফা' বলা হয় না। বলা হয়, 'ইমাম আবু হানীফা'। উনার এক নম্বর শাগরিদ হলো ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.)।

আমাদের কিছু ভাই, যাঁরা লা-মাযহাবী, তাঁরা বলছেন–এই ফকীহদের দরকার নেই। কারণ তাঁদের অনুসরণ করা শিরক...! অথচ হাদীসের মধ্যে এসেছে :

رب حامل فقه غير فقيه

এক রেওয়ায়াতে এই পর্যন্ত এসেছে। অর্থ : অনেক মুহাদ্দিস আছে, যারা ফকীহ না। তারা "হামেলে ফিকহ" অর্থাৎ তারা ফিকহ বহন করে, কিন্তু ফিকহকে হাদীস থেকে বের করতে পারে না। তাদেরকে "হামেলে ফিকহ" বলা হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই বলা হচ্ছে যে, সে ফকীহ না।

আরেক জায়গায় আছে,

رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

অর্থ : কিছু মুহাদ্দিস আছে, যারা মুহাদ্দিস বটে। কিন্তু সে এমন ব্যক্তির

কাছে হাদীস পৌঁছায়, যে ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি ফকীহ, অনেক বেশি "ইস্তিম্বাত" করবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৬৬০, তিরমিযী, হাদীস নং-২৬৫৬)। এই সব হাদীসের মধ্যে নবীজি যে কথাটি বলেছেন, তা হলো সব মুহাদ্দিস কিন্তু ফকীহ না। হ্যাঁ, মুহাদ্দিসদের মধ্যে একটি গ্রুপ আছে ফকীহ। এই কথা দ্বারা এটি বোঝা গেল।

এই হাদীস দ্বারা আরেকটি কথা বোঝা যায়, যা বোঝার জন্য একটু ভূমিকা শুনুন!

নবীজি (সা.) যত খবর দিয়ে গেছেন, ওই সব খবর দ্বারা উদ্দেশ্য "অর্ডার"। নবীজির কোনো খবর শুধু খবর নয়। আমার কথাটি বুঝতে হবে। যেমন তিনি খবর দিয়েছেন, তালবে ইলমের জন্য ফেরেশতারা পর বিছিয়ে দেয়। তো এটা কি খবর না অর্ডার? এটা কি শুধু সংবাদ দেয় যে তালবে ইলমের জন্য ফেরেশতারা পর বিছিয়ে দেয়। আমি একটু আগে দাবি করলাম যে কোনো খবর উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো অর্ডার। তো এ কথা বলছেন শুধু সংবাদ দেওয়ার জন্য নয়। বরং এ কথা বোঝানোর জন্য যে তোমরা তালেবুল ইলম হও। এই অর্ডার আছে কিন্তু এর মধ্যে। ঠিক এখানে যে বললেন, সব মুহাদ্দিস কিন্তু ফকীহ হবে না...। এখানেও তো অর্ডার আছে। সেই অর্ডার হলো, তোমরা ফকীহ তৈরি করো। বিভিন্ন মাদরাসায় দারুল ইফতা খোলো এবং মুফতি বসাও, মুফতি বানাও!

নবীজির কথা দ্বারা বোঝা গেল যে মুহাদ্দিস যথেষ্ট নয়। ফকীহ লাগবে। জেলে যথেষ্ট নয়; ডুবুরিও লাগবে।

তো নবীজির কথা দ্বারা বোঝা গেল যে ফকীহ লাগবে। আর আহলে হাদীসরা বলছে যে, কোনো ফকীহ লাগবে না। তো কী করতে হবে? "প্রত্যেককে একটি বাংলা বুখারী বগলে রাখতে হবে..!!"

আরে! প্রত্যেকেই কি হাদীস বোঝার যোগ্যতা রাখে? হাদীসের তরজমা বুঝলেই কি আমল করা যায়?

আমি অনেক হাদীস পেশ করতে পারব যে, সাহাবীরা রাসূলের হাদীসের শাব্দিক অর্থের ওপর আমল করেননি। সরাসরি যে অর্থ তার ওপর আমল করেননি। এটা না করাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারাজ হননি। আরো খুশি হয়েছেন। কারণ তারা শব্দ না দেখে হুজুরের উদ্দেশ্য কী, এটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। আহলে হাদীসরা শব্দ দেখে আমল করে। অন্তর্নিহিত কারণ কী? ওটা দেখে না! বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না। বরং বোঝার যোগ্যতাই রাখে না।

সময় স্বল্পতার কারণে আমি দু-একটি হাদীস পেশ করছি, যার দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন যে শুধু শব্দ দেখে আমল করলে হবে না।

১. হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা সন্ধি করতে রাজি হলো না যে, আপনার নামের সাথে "রাসূলুল্লাহ" লেখা হয়েছে কেন? নবীজিকে বলল, আপনাকে যদি "রাসূলুল্লাহ"ই মেনে নিই, তাহলে আপনাকে বাইতুল্লাহতে ঢুকতে দিতে অসুবিধা কী? ঝগড়া তো এই জায়গায়। তাহলে এটা কাটেন। নবীজি তো উম্মী ছিলেন, উনি লিখতে পারতেন না। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে বললেন যে সুলাহনামা থেকে "রাসূলুল্লাহ" কথাটি কেটে দাও। হযরত আলী (রা.) পরিষ্কার বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওরা আপনাকে রাসূলুল্লাহ মানুক আর নাই মানুক, সন্ধি হোক না হোক, এটা ঠিক থাকবে।' উনি কাটলেন না। তো সুলাহও হয়নি। ফলে নবীজি আরেকজন সাহাবীকে দিয়ে ওটা নিজেই কেটে দিলেন। কাজ আগে বাড়ল...। পুরো ঘটনা বলা যাবে না। আমি একটু একটু বলব বোঝার জন্য। তো এই যে হযরত আলী (রা.) নবীজির কথাটি রাখলেন না, এতে কি উনি নারাজ হয়ে গেলেন। অর্ডার মানেননি, তো রাসূলুল্লাহ কি নারাজ হয়েছেন? বুঝতে পেরেছেন যে হযরত আলীর ঈমানী গায়রত, ঈমানী শক্তির কারণে তা পারছেন না। বরং নবীজি খুশি হয়ে গেলেন। (বুখারী, হাদীস নং-৪২৫১)

দুই : নবীজির কাছে এক লোক সম্পর্কে রিপোর্ট এল যে অমুক লোক অমুক বাদীর সাথে মেলামেশা করে। কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও খাড়া হয়ে গেল, যা বাস্তবে সঠিক ছিল না। রাসূল তো গায়েব জানেন না। নবীজি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সেই লোকটিকে কতল করার অর্ডার দিয়ে দিলেন। হযরত আলী (রা.)-কে দায়িত্ব দিলেন। হযরত আলী (রা.) ওই লোকের এলাকায় গেলেন। গিয়ে দেখেন যে সে এক কুয়ার মধ্যে শরীর ঠাণ্ডা করছে। তো হযরত আলী (রা.) অর্ডার করলেন : উঠো। তো সে হাত বাড়িয়ে দিল যে আমি তো একা উঠতে পারব না, হাত ধরে উঠাও। তো হযরত আলী (রা.) হাত বাড়িয়ে দিলেন। ওই বেচারা যেকোনো কারণেই হোক, তার পরনে কিছু ছিল না। হযরত আলীর নজর পড়ল ওই ব্যক্তির সতরের ওপর। তখন তিনি

লক্ষ করলেন–তার পুরুষাঙ্গ নেই, ছোটকাল থেকেই কাটা। তখন চিন্তা করলেন, তার জন্য তো যিনা করা সম্ভবপর নয়। তখন আলী (রা.) ফিরে এলেন এবং বললেন–হুজুর! আপনি তো আমাকে তাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছেন। সে তো পুরুষাঙ্গহীন। তখন হুজুর বললেন, 'ঠিক করেছ, হয়তো সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।' (মুসলিম শরীফ ২৭৭১)

এখন এই যে আলী (রা.) নবীজির কথা মানলেন না; তাঁর ওপর হুকুম ছিল গিয়েই তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া, গর্দান না উড়িয়ে চলে এলেন। নবীজি কি রাগ হয়েছেন? নবীজির কথা বাহ্যিকভাবে অমান্য করেছেন, অথচ নবীজি খুশি হয়েছেন।

তিন : এক মহিলাকে বেত্রাঘাত করার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে পাঠালেন। সেই মহিলা যিনা করেছে। হযরত আলী (রা.) সেখানে গিয়ে খবর পেলেন যে সেই মহিলা দু-এক দিন আগে সন্তান প্রসব করেছে। খুবই দুর্বল। তখন বেত্রাঘাত না করে ফিরে এলেন। এসে নবীজিকে রিপোর্ট দিলেন যে সেই মহিলা সন্তান প্রসব করার কারণে খুবই দুর্বল। বেত্রাঘাত করলে হয়তো মারা যাবে। সুস্থ হোক, তারপর বেত্রাঘাত করা হোক। তখন নবীজি এটিকে পছন্দ করলেন।

(মুসলিম হাদীস নং-১৭০৫)

তো পাঠালেন বেত মারার জন্য, না মেরেই চলে এলেন। তার পরও তো নবীজি রাগ করলেন না। সুতরাং বোঝা গেল যে শুধু হাদীসের শব্দ বুঝলেই চলবে না, বরং মর্ম বুঝতে হবে। এখানে রাসূলের কথার আসল উদ্দেশ্য কী, তা বুঝতে হবে? তার মধ্যে কোনো কারণ আছে কি না, জানতে হবে। তা জানার জন্য চার মাযহাবের ইমাম লাগবে। সুতরাং ইমাম মানা শিরক নয় বরং জরুরি।

তিন নম্বর কারণ : আমরা বলি, "নবীজির ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হক্বের ওপর ছিলেন"। কিন্তু কোনো বাতিল ফিরকা এই কথাটি মানেনি।

যেমন : শিয়া বাতিল দল। তারা বলে, "নবীজির ইন্তেকালের পর পাঁচজন সাহাবী ছাড়া সব সাহাবা মুরতাদ হয়ে গেছেন!" (নাউযু বিল্লাহ)

আরেক দল আছে 'মওদুদী সাহেবে'র অনুসারী। তারা বলে যে, "নবীজি বাদে আর কাউকে হক্বের মাপকাঠি মানা যাবে না!"

তাহলে কি তারা সাহাবায়ে কেরামকে মানল? তো শিয়াদের যে রোগ, মওদুদী সাহেবের অনুসারীদের একই রোগে পেয়েছে।

বর্তমানে আহলে হাদীসদের একই কথা যে, "নবীজির ইন্তেকালের পর সাহাবারা হক্বের ওপর টিকে ছিলেন না। নবীজি তাঁদেরকে শিখিয়ে গেছেন তারাবীহ আট রাক'আত পড়ার জন্য। তারা উমর (রা.)-এর নেতৃত্বে বিশ রাক'আত চালু করে দিল। এভাবে তারা গোমরাহ হয়ে গেল!" (নাউযু বিল্লাহ)

নবীজি তাদেরকে নাকি আট রাক'আত শিখিয়ে গিয়েছিলেন! আট রাক'আতের দলিল কোথায়? "তারাবীহ আট রাক'আত"-এর কোনো দলিল আছে কি?

চারটি মাযহাব আল্লাহ দুনিয়াতে চালু করেছেন। কোন মাযহাবে কি তারাবীহ আট রাক'আত আছে? আহলে হাদীসরা তাহাজ্জুদের দলিল নিয়ে লাগিয়েছে তারাবীহর মধ্যে। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "নবীজির রাত্রের নফল নামায কত রাক'আত ছিল?" তিনি বললেন, "নবীজি রমাজানে এবং রমাজানের বাহিরে আট রাক'আতের বেশি রাত্রের নফল পড়তেন না।" (বুখারী হাদীস নং-১১৪৭) যখন রমাজানের বাহিরের কথা আয়েশা (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা কি আপনারা বুঝছেন না যে, এটা তারাবীহর আলোচনা নয়? কারণ তারাবীহ রমাজানে বাহিরে পড়া যায় না। এই হাদীসটি মূলত তাহাজ্জুদের দলিল। কিন্তু তারা তাহাজ্জুদের হাদীসকে তারাবীহর জায়গায় লাগিয়ে সব সাহাবায়ে কেরামকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করছে যে তারা নবীজির তা'লীম ঠিক রাখেনি। নবীজি বলে গেছেন, "তারাবীহ আট রাক'আত"; আর তারা বলছে, "তারাবীহ বিশ রাক'আত।" তাহলে কি সব সাহাবা (রা.) গোমরাহ হয়ে গেছেন...? (বলুন–না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক!!)।

তারা আরো দলিল দেওয়ার চেষ্টা করে যে, নবীজি বলে গেছেন, "তিন তালাকে এক তালাক হয়। আর সাহাবা (রা.) বলছেন, "তিন তালাকে তিন তালাক হয়। এখানেও তারা নবীজির কথা রাখেনি। না রেখে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে!"

(বলুন–না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক!!)

তাদেরকে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি বুখারী মানো?" কী বলবে? মানে? তাহলে বুখারীতে লেখা আছে, "তিন তালাকে তিন তালাক"। (বুখারী হাদীস নং-৫২৫৯) তুমি এক

মুখে বলছো, "বুখারী মানো", অথচ বুখারীতে লেখা আছে, "তিন তালাকে তিন তালাক"। তাহলে সাহাবারা এ কথা বলে গোমরাহ হয়ে গেল কিভাবে?

বুঝতে পারলেন, তাদের সাথে আমাদের ঝগড়াগুলো কোথায়? মনে রাখবেন, তারা বলে–

১. "ইজমা-কিয়াস কিছু লাগবে না।"

২. নবীজি বলছেন, "ফকীহ লাগবে।" তারা বলে, "ফকীহ লাগবে না।"

৩. নবীজি বলে গেছেন, "আমার সমস্ত সাহাবী সত্যের মাপকাঠি।" তারা বলে যে, "সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি নয়।"

৪. আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে ইমাম মানার কারণে তারা মুশরিক বলছে।

এসব মারাত্মক ভুলের কারণে উলামাগণ তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার সাড়ে ১৫ আনা মানুষ ইমাম মানে। লোহিত সাগরের পশ্চিম পাড়ের অধিকাংশ লোকেরা মালেকী। আর আরব ভূখণ্ডের অধিকাংশ লোকেরা হাম্বলী। আর আমরা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হানাফী। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া শাফেয়ী। সারা দুনিয়ার মুসলমান মাযহাবী। তারা হাতে গোনা কয়েকটি মানুষ আমাদেরকে বলছে মুশরিক। যদি কোনো মুসলমানকে বেঈমান বলা হয়, আর প্রকৃতপক্ষে সে বেঈমান না হয়, তাহলে সেই বেঈমান হয়। সারা দুনিয়ার মানুষ বেঈমান হয়ে গেল আর অল্প কয়েকজন মাত্র ঈমানদার রয়ে গেল...!

তারা বুখারী ও মুসলিম মানে। তাহলে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ তারা মাযহাব মেনেছে কি না? বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এই চারজন শাফেয়ী ছিলেন। নাসায়ী, আবু দাউদ হাম্বলী ছিলেন। সাহাবীদের পরে চার ইমামের যুগ। চার ইমামের পরে সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফদের যুগ। তারা সবাই মাযহাব মেনেছে। ইমাম আহমদ (রহ.) ইমাম বুখারীর সরাসরি উস্তাদ ছিলেন। কিন্তু তারা কেউ এ কথা বলেনি যে, "মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই। আমার এই কিতাব বগলে রাখো আর তা দেখে দেখে আমল করো...!

এ কথা কি তারা কোথাও বলেছে? বলেনি, তারা নিজেরা কী করেছেন? তাঁরা চার ইমামের কাউকে মেনেছেন? আমার একটি কিতাব আছে মাজহাব ও তাকলীদ। এখানে আমি দেখিয়েছি যে আজ পর্যন্ত যারা হাদীস জমা করেছে কে কোন মাজহাবের অনুসারী ছিল। আজ পর্যন্ত যাঁরা তাফসীরের কিতাব লিখেছেন তাঁরা কোনো এক মাজহাবের অনুসারী ছিল এবং যে কিতাব দিয়ে হাদীসকে সহীহ যয়ীফ বলে এই কিতাবগুলো মাজহাবীরা লিখেছে। ফাতওয়ার কিতাবগুলো কারা লিখেছে? এই মাজহাবীরা লিখেছে। কোরআনে কারীমের যত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ আছে, তা সবই মাযহাবী উলামাগণ লিখেছেন।

ব্রিটিশের পূর্বে আহলে হাদিসের কোনো কিতাবই পাবেন না। এরা ভূঁইফোড় গোষ্ঠী!

তো সবাই তো মাজহাবী ছিল। এরা যদি সবাই মুশরিক হয়ে থাকে তাহলে তোমরা বুখারী শরীফ দিয়ে দলিল দাও কেন? তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ কিতাবে আল্লামা সুবকী লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী শাফেঈ মাজহাবের ছিলেন। (তবকাতুশ শাফিইয়্যাহ ১/৪২১) মাজহাব মানলে যদি কেউ বেঈমান হয়ে থাকে তাহলে ইমাম বুখারী বেঈমান হয়ে গেছেন। তাহলে বেঈমানের কিতাব দিয়ে তোমরা দলিল দিচ্ছো কেন?

এমনিভাবে নুখবাতুল ফিকার, মুকাদ্দামায়ে ইবনে সলাহসহ উসূলে হাদীস ও তারাজীমের যেসব কিতাবের সাহায্যে হাদীস সহীহ না যয়ীফ নির্ণয় করে–এগুলোর লেখক তো মাজহাবী ছিলেন। তো মাজহাব মানা যদি শিরক হয়ে থাকে তাহলে মুশরিকের কিতাব দিয়ে হাদীস সহীহ না যয়ীফ, তা সাব্যস্ত করছ কেন?

এবার আসেন এই লোকগুলো যে এতগুলো অন্যায় করল–

১. তারা ইজমা-কিয়াস মানে না।

২. নবীজি বলেছেন ফকীহ লাগবে, তারা ফকীহ মানে না।

৩. নবীজি বলেছেন সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি, তারা বলে সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি নয়।

৪. নবীজি বলেছেন মুমীনের ব্যাপারে সুধারণা রাখতে এবং কাফের না বলতে। অথচ তারা সবাইকে মুশরিক বলছে।

৫. তারা সুন্নী মুসলমানদের মিত্র নয়। ব্যাখ্যা সামনে।

এখন বলেন, এই লোকগুলোর ব্যাপারে কি হুজুররা চুপ থাকবে? না তাদের মুখোশ খুলে দেবে? যাতে করে তারা আপনাদের সবাইকে বেঈমান বানিয়ে ফেলতে না পারে!!

৫. আরেকটি কথা শুনুন, আমেরিকা যদি কোনো দেশে বোমা মারতে চায়

সরাসরি পারে না, বরং ওই দেশের কিছু সাপোর্ট লাগে। কুড়াল ততক্ষণ লাকড়ি কাটতে পারে না, যতক্ষণ তার মধ্যে লাকড়ি না দেওয়া হয়। আমেরিকা একা কিছু করতে পারে না, কিছু লোক তাদের সাহায্য করতে হয়। তা না হলে মুসলমানদের এতগুলো দেশ কাফেররা ধ্বংস করল কিভাবে? ধরুন, যারা শিয়া আছে তারা আমেরিকার সাথে যোগ দিয়েছিল, বিভিন্ন দেশে এটা শুরু হয়ে গেছে। ওই সকল দেশে বিভিন্ন খনি আছে আমেরিকা সেগুলো লুণ্ঠন করে। সুতরাং দেখা গেছে যে আমেরিকা কোনো দেশে সুন্নী মুসলমানদেরকে আপন করে না, তারা হয় শিয়াদেরকে আপন বানিয়ে সুন্নীদেরকে মারে, অথবা কোনো
কোনো দেশে আহলে হাদীসদেরকে আপন বানিয়ে সুন্নীদেরকে মারে। বোঝা গেল, এরা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ নয়। আমেরিকা আমাকে আপনাকে বিশ্বাস করে না, বরং তাদেরকে বিশ্বাস করে। আল্লাহ না করুন বাংলাদেশকে যদি আমেরিকা ধ্বংস করতে চায় তাহলে অস্ত্র, টাকা ইত্যাদি কাকে দেবে? আপনাকে, না এদেরকে?
তারা আপনাকে মারবে, এই বলে যে এরা কাফের, এদেরকে মারতে হবে। সুতরাং ৫ নম্বর কথা হলো, তারা আমেরিকার বন্ধু। তারা তাদেরকে মসজিদে গিয়ে আমীন জোরে বলার জন্য পাঠিয়েছে। আমি তো ঢাকায় বিভিন্ন মসজিদে বলে দিয়েছি, আপনারা ছোট করে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিন যে এই মসজিদে সবাই আস্তে আমীন বলেন। এখানে চিৎকার করে আমীন বলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ নেই। যদি কেউ এই দলের হয়ে থাকেন তিনি যেন এই মসজিদে না ঢোকেন। মোহাম্মদপুরে একটি মসজিদ আছে। আল আমীন মসজিদ। সেখানে চিৎকার করে আমীন বলার চর্চা আছে। আপনারা সে মসজিদে চলে যান। যত পারেন, সেখানে গিয়ে চিৎকার করুন এবং দুই পা যত পারেন, ফাঁকা করে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুন, কোনো অসুবিধা নেই।
দুই পায়ের মাঝে এত বিশাল ফাঁকা রেখে নামাযের কথা কোনো হাদীসে এসেছে? কখনো শুনেছেন এ রকম হাদীস? এদের সম্পর্কেই রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, নবীজি বলেছেন–

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

শেষ যামানায় কিছু ধোঁকাবাজ-মিথ্যুক প্রকাশ পাবে। যারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শোনাবে, যা তোমরা ইতিপূর্বে কখনো শোনোনি, এমনকি তোমাদের পূর্বপুরুষ বাপ-দাদাও শোনেনি। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। তাদের কথিত হাদীস যেন তোমাদের গোমরাহ করতে না পারে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭)
রুকু-সিজদায় ঘোড়ার লেজের মতো হাত তোলা বা নামাযে দুই পায়ের মাঝে বিস্তর ফাঁক রেখে দাঁড়ানো এ রকম হাদীসগুলো শুনেছেন কখনো? তারা কাযা নামাযের ব্যাপারে ফাতওয়া দেয়, 'ইসলামে কাযা নামায নেই। তাওবা করে নিলেই চলবে!...” এ-জাতীয় হাদীস কখনো শুনেছেন? অথচ কাযা নামাযের কথা হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার উদ্ধৃত হয়েছে। (বুখারী হাদীস নং-৫৯৭, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২৩৪৯, ১৬৯৭৫) এমনকি হাদীসের কিতাবগুলোতে কাযা নামাযের পদ্ধতিও বাতলে
দেওয়া হয়েছে। তারা আরো বলে, 'আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে দিয়ে পাঁচটি কবীরা গোনাহ করিয়েছেন!' তারা এও বলে, 'সাহাবারা নবীজির ইন্তেকালের পর গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলেন!' কোথাও শুনেছেন এ রকম হাদীস? মুসলিম শরীফের হাদীসে যাদের কথা বলা হয়েছে, দেখা গেল এরাই তারা। হাদীসে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, “তাদের থেকে দূরে থাকো, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।”
এই গোষ্ঠীর নাম 'আহলুল হাদীস'। আর আমাদের নাম হচ্ছে “আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ”। আপনারা বিচার করুন তো কোন নামটা সঠিক? আহলে হাদীস না আহলে সুন্নাহ? বিচার করার আগে হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য বুঝতে হবে। একসময়ে এই পার্থক্য জানার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ঈমান হেফাজতের জন্য এই পার্থক্য জানা জরুরি হয়ে পড়েছে। হাদীস কী? নবীজি ২৩ বছরের যাবতীয় কথা, কাজ, সমর্থন, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি ও দৈহিক অবকাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল বর্ণনাই হাদীস। হাদীস হচ্ছে ভাণ্ডার। আর এই ভাণ্ডারের একটি বিশেষ

অংশ হচ্ছে সুন্নাহ। সুন্নাহ হচ্ছে যা উম্মাহর জন্য অনুসরণযোগ্য। হাদীসের ওই অংশ সুন্নাহ, যাতে উম্মাহর করণীয়-অনুসরণীয় বিষয় রয়েছে। আর যেসব হাদীসে করণীয় কিছু উল্লেখ নেই যেমন–দাজ্জালের আগমন দাব্বাতুল আরদ ইত্যাদির ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে "করণীয়" নেই। (সূরা নামল ৮২, বুখারী হাদীস নং-৭১২৪) তাই এগুলো হাদীস বটে। কিন্তু সুন্নাহ না। এ রকমভাবে হাদীসে করণীয় কোনো বিধান উল্লেখ থাকলে তখন দেখতে হবে সেটা কি এখনো বলবৎ আছে কি না? নাকি মানসুখ তথা রহিত করা হয়েছে? যেমন–বুখারী শরীফে ছয় জায়গায় এসেছে ইমাম সাহেব বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়ো। এই হাদীসের হুকুম আমাদের জন্য বাকি নেই। বরং রহিত হয়ে গেছে। দলিল হলো, ইন্তেকালের আগে রাসূল (সা.) কয়েক দিন মসজিদে যেতে পারেননি। বুধবার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত। শনিবার যোহরের নামাযে রাসূল (সা.) দুজন সাহাবীর কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেন। তারপর তিনি 'বসে' যোহরের নামায পড়ালেন। আর পেছনে সাহাবীগণ সবাই 'দাঁড়িয়ে' নামায আদায় করলেন। (বুখারী হাদীস নং-৬৮৭, মুসলিম হাদীস নং-৪১৮)

সুতরাং বোঝা গেল, বুখারী শরীফের আগের হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এখন সেটা হাদীস হিসেবে রয়ে গেছে। কিন্তু অনুসরণ করা যাবে না। তাই এটা সুন্নাহ নয়। যদি বসে পড়ার হাদীস রহিত না হতো, তাহলে সাহাবাগণ বসে না পড়ে, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন কেন? এ জন্য বসে ইক্তেদা করার হাদীসটি কেবলই হাদীস, সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ অনুসরণযোগ্য নয়। অতএব বোঝা গেল, হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যে অংশটুকু আমাদের জন্য আমলযোগ্য বা পালনীয় এবং তা নবীজি (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল, শুধু সেই অংশটুকু সুন্নাহ।

এ কারণেই যখন বলা হয় শরীয়তের দলিল কী কী? তখন বলা হয় "কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।" এই আলোচনা দ্বারা হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য বোঝা গেল। এ জন্য আমরা বলি, আমাদের জামাতের নাম হচ্ছে 'আহলে সুন্নাহ।' 'আহলে হাদীস' নয়। কারণ আমরা সুন্নাহ অনুসরণ করি। আহলে হাদীস যারা দাবি করে তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা যদি হাদীসের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে ১১টি বিয়ে করুন। কারণ হাদীসে আছে রাসূল (সা.) ১১ জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন।' এমনকি ৯ জন স্ত্রীকে রেখে ইন্তেকাল করার হাদীস বুখারীতেই আছে। (বুখারী হাদীস নং-২৬৮) বলুন তো! ১১ জন বিয়ে করার অনুমতি আছে আমাদের জন্য? না! অনুমতি নেই। ১১ জন বিয়ের কথা "হাদীস" কিন্তু "সুন্নাহ" নয়। উম্মাহর অনুসরণযোগ্য নয়। "আহলে হাদীস" নামটাই ভুল। হাদীসের অনুসারী দাবি করলে তো সেসব হাদীসও অনুসরণ করা জরুরি, যা আমাদের জন্য নয়। রাসূলের সাথে খাস বা রহিত হয়ে গেছে।

বুখারী শরীফে উল্লেখ থাকলেই সেটা অনুসরণযোগ্য হয়ে যায় না। বুখারীতে এমন অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যা রহিত হয়ে গেছে অথবা যা রাসূলের সাথে খাস। সেগুলো সুন্নাহ নয়। বরং হাদীস। একটু আগে বলেছিলাম, স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর যদি বীর্যপাত না হয়, তাহলে গোসল ফরজ হয় না। এই হাদীস বুখারীতে দুই জায়গায় আছে। (বুখারী হাদীস নং-১৭৯, ২৯৩) অথচ এটা মানা জায়েয নেই। এটা হাদীস, কিন্তু সুন্নাহ নয়।

সারকথা, আমরা 'হাদীসের' অনুসারী দাবি করি না। আমরা 'সুন্নাহর' অনুসারী দাবি করি। হাদীসের অনুসারী বা 'আহলে হাদীস' দাবি করাই গলদ। এখানে উলামাগণ উপস্থিত আছেন। আমার কথায় ভুল হয়ে থাকলে বলবেন।

সুতরাং, বাছাই করতে হবে কোনগুলো উম্মতের জন্য; সেগুলো মানতে হবে। আর সেই বাছবিচার করার দায়িত্ব হলো মুফতিদের ও উলামায়ে কেরামের। আপনারা নিজে নিজে বুখারীর বাংলা তরজমা পড়বেন না। কারণ বুখারীতে রহিত হাদীসগুলোর কথা আলাদা করে চিহ্নিত করা নেই। ফলে আপনি বুখারী শরীফ পড়ে মসজিদে এসে গোলমাল করবেন যে আমি হাদীসে পড়ে এলাম এতবার হাত তুলতে হয়, অথচ আমাদের হুজুররা হাত তুলছেন না। তাঁরা কোন কিতাব পড়লেন? আমি তো বুখারী পড়েছি...। আমি বলব, আপনি তো বুখারী পড়ছেন না, বরং "বোকামি" পড়ছেন। অর্থাৎ অনুবাদ পড়ে এসেছেন। বুখারীর এক লাইনও তো পড়তে পারবেন না।

কারণ ওখানে যের-যবর দেওয়া নেই। আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম, যেখানে যের-যবর দেওয়া নেই কোনো
আহলে হাদীস যদি এমন বুখারী শরীফের এক লাইন পড়ে শোনাতে পারেন, তাহলে আমি তাঁকে পুরস্কার দেব।
এক জায়গায় এই চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পর একজন আহলে হাদীস দাঁড়িয়ে বলল, আমি এক লাইন পড়ে দিই। আমি তাকে কাছে ডেকে বুখারী শরীফ সামনে খুলে দিয়ে তাকে পড়তে বললাম। সে পড়া শুরু করল এই বলে, ছানা... ছানা...। আমি বললাম, বুখারী শরীফে ছানা-জিলাপি পেলেন কোথায়? এটা কি মিষ্টির কিতাব ছানা-জিলাপি সব পাওয়া যাবে এখানে? সে বলল, এই যে দেখেন হুজুর, ছা নূন আলীফ লেখা আছে, তাহলে কী হবে? আমি বললাম, আরে এটা তো "হাদ্দাছানা"-কে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে...!
এই হলো তাদের হাদীস পড়ার অবস্থা। এবার বলুন, তাদের 'আহলে হাদীস' নাম দেওয়াটা সহীহ আছে কি না?
আমরা যে ইজমা-কিয়াস মানি তার দলিল হলো–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

এই আয়াতের তাফসীর করেছেন আল্লাহ তা'আলা আরেক আয়াত দিয়ে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

এই আয়াত হলো আগের আয়াতের তাফসীর। আল্লাহ যে বলেছেন, আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। প্রশ্ন হলো, পরিপূর্ণ কিভাবে হলো? পরিপূর্ণ এভাবে হলো যে এমন
কোনো হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা থাকবে না, যার কোনো সমাধান নেই। আর সেটা এভাবে যে, أَطِيعُوا اللَّهَ এটা হলো কোরআন, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ এটা হলো সুন্নাহ, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ এটা হলো ইজমা। অর্থাৎ ইমামগণ একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত দেবেন, সেটাই ইজমা।
আর فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ এটা হলো কিয়াস। এই আয়াতের এই তাফসীর আমি কমপক্ষে দশটি তাফসীরের কিতাবে পেয়েছি। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শরীয়তের দলিল চারটি। এই চারটি দলিল দ্বারা ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং যারা এই চারটির দুটিই মানে না, সে সমাধান করবে কিভাবে? এ কারণে আমি এখানের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে একটি কাগজ দিয়েছিলাম বিতরণ করার জন্য। যেখানে আমি আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে দশটি প্রশ্ন করেছি। তারা যদি নিজেদের দাবিতে সঠিক হয়ে থাকে তাহলে যেন তারা এই দশটি প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমি এই চ্যালেঞ্জ করেছি কমপক্ষে ছয় মাস হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। কিছুদিন পূর্বে হজে
গিয়েছিলাম। সেখানে মদীনা ভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশে আমি বয়ান করেছি। তাদেরকে বলেছিলাম, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আহলে হাদীস থাকে তাহলে সে এ দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। চার মাজহাবের যে কেউ জবাব দিতে পারবে। কারণ তারা ইজমা-কিয়াস মানে। ওরা পারবে না। কারণ ওরা ইজমা-কিয়াস মানে না।
আমার সেই দশটি প্রশ্নের মধ্য থেকে একটি প্রশ্ন হলো, বিমানে নামায পড়া যাবে কি না? এর একটি সমাধান প্রয়োজন। আপনারা তাদেরকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে এর সমাধান দিতে বলুন। যেহেতু তারা শুধু কোরআন ও হাদীস মানে, আর কোরআন-হাদীসের কোথাও বিমানে নামায পড়ার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং তারা এর কোনো সমাধানও দিতে পারবে না। এমন দশটি প্রশ্ন আমি তাদের উদ্দেশে করেছি, যা তারা আজ পর্যন্ত উত্তর দিতে পারেনি। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত পারবে না! কারণ তারা গোমরাহ!!
আমি একটি বিষয় বলে শেষ করছি, খুব খেয়াল করে শোনেন। বিষয়টি এই–মাযহাব মানা এমন একটি বিষয় যে মাযহাব মানা ছাড়া হাদীস মানা যায় না। তার একটি নমুনা দেখুন :
নামাযে দাঁড়াবেন কিভাবে? এক রেওয়াতে পাওয়া যায়, পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৭২৫) এখানে নিজের এক পা আরেক পায়ের সাথে মিলাবে? নাকি আরেকজনের পায়ের সাথে নিজের পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে? তার উল্লেখ নেই। আরেক রেওয়াতে আছে যে, তোমাদের দুজনের পায়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, সেখানে জুতা রেখো না। (আবু দাউদ হাদীস নং-৬৫৪)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়,
দুজনের পায়ের মাঝে একটু খালি জায়গা থাকবে, যেখানে জুতা রাখা নিষেধ।
তো এক রেওয়াতে আছে, মিলিয়ে দাও। আরেক রেওয়াতে আছে, খালি জায়গা থাকবে। তাহলে আমল করবেন কিভাবে? তারা কী করছে? মিলিয়ে রাখার হাদীসটি গ্রহণ করে ফাঁক রাখার হাদীসটি ছেড়ে দিয়েছে, অস্বীকার করে বসেছে। কোনো
হাদীস তাদের মতে না মিললে তারা বলে 'জয়ীফ হাদীস'। জয়ীফ কাকে বলে, তারা কি সেটা জানে? [না]। জয়ীফ কার গুণাগুণ? বর্ণনাকারীর না হাদীসের? কোনো বর্ণনাকারী দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিল এ কারণে তার হাদীসগুলো জয়ীফ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে হাদীস তো রাসূলের। জয়ীফ বলা হয় বর্ণনাকারীর দিকে লক্ষ করে। যাই হোক, হাদীস তো দুই ধরনের। তো ওরা একটি নিল, একটি বাদ করে দিল। অথচ রাসূলের হাদীস। এ ব্যাপারে আমাদের ইমাম সাহেব ফয়সালা করেছেন, উভয়ের পা কাছাকাছি রাখো; মানে তোমরা দুজনের দুই পা কাছাকাছি রাখো। একদম মিলিয়ে দিও না। আবার একদম ফাঁকাও রেখো না। এটা এক ধরনের মিলানো। আবার এটা ফাঁক রাখাও। উভয় হাদীসের ওপর আমল হবে। যেটাতে ফাঁক রাখতে বলা হয়েছে, তার ওপর আমল হয়ে যাবে। আমরা কোনটা বাদ দিলাম? আমরা একটিও বাদ দিলাম না।
এবার আসুন, হাত বাঁধবেন কোথায়? এক হাদীসে নাভির নিচে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং-৩৯৫৯) এটা বেশি মজবুত। আরেক হাদীসে নাভির ওপর, সেটা জয়ীফ। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং-৪৭৯) এই হাদীসের একজন রাবী আছেন, 'মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল'। তিনি একটু দুর্বল। যাক দুর্বল হোক হাদীস কয়টা আছে, দুইটা। নাভির নিচে ও ওপরে। তো কোনটার ওপর আমল করবেন। ওরা বলছে, আমরা নাভির ওপরেরটি। তো নাভির নিচেরটা কী হবে? ওটা বাদ। আমরা একটিও বাদ দেব না। আমাদের ইমাম সাহেব কোনোটাই বাদ দিলেন না, বরং তিনি ফয়সালা দিলেন : তোমরা পুরুষরা নাভির নিচে হাত বাঁধো, মহিলারা বুকের ওপর হাত রাখো। উভয় হাদীসই ঠিক। একটি হাদীস পুরুষদের জন্য আরেকটি হাদীস মহিলাদের জন্য। ওরা কোনটি নিয়ে গেছে? মহিলাদেরটি। আর পুরুষেরটি বাদ করে দিল! দেখেন কারবার!
তারপর সূরা ফাতিহা পড়বেন কি না? এক হাদীসে আছে ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না। 'মুআত্তা মালিক'সহ প্রায় ৫-৭টি কিতাবে আরেকটি হাদীস আছে,
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
তোমাদের যার ইমাম থাকবে তার ক্বেরাত পড়া লাগবে না। তার ইমামের ক্বেরাতই তার ক্বেরাত। হাদীস কয় রকম? দুই রকম। তো আপনি কী করেন? ওইখানে ইমাম থাকলে ক্বেরাত পড়া যাবে না। আর এরা বলে, ইমাম থাকলেও ক্বেরাত পড়া ছাড়া নামায হবে না। ওরা ফাতিহা পড়ারটি নিয়েছে আর এটিকে একদম বাতিল করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, বাদ দিল কেন? আমরা যারা মাযহাব মানি, আমরা তো একটিও বাদ দেই না। কেননা আমাদের ইমাম সাহেব ফয়সালা করে দিয়ে গেছেন। কী ফয়সালা করেছেন? যে, "ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না"-এ হাদীসটা ইমামের ব্যাপারে আর একা নামায পড়নেওয়ালার ব্যাপারে। আর "দ্বিতীয় হাদিসটি" ইমামের পিছে মুক্তাদির জন্য।
তো আমরা উভয় হাদীসের ওপর আমল করলাম। যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকি তখন কোনটার ওপর আমল করি? মুক্তাদির জন্য ক্বেরাত নেই। আর যখন একা হই তখন ক্বেরাত পড়ি। এখন ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না–এ হাদীসটা কার ব্যাপারে? ইমাম এবং একা নামায পড়নেওয়ালার ব্যাপারে, ইমামের পিছে মুক্তাদীর ব্যাপারে নয়। তার ব্যাপারে ধরলে কী অসুবিধা হবে জানেন? অনেক সময় আপনি আসবেন, যখন ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন। তখন ফাতিহা কখন পড়বেন? বলেন তো কখন পড়বেন? যদি বলে রুকুতে গিয়ে পড়ব, তাহলে প্রশ্ন হবে–আল্লাহর রাসূল বলেছেন, রুকুতে ও সিজদায় তোমরা কোরআন পড়বে না
وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
রুকুতে গিয়ে কোরআন পড়বে না। (মুসলিম, হাদীস নং-৪৭৯) তাহলে কী করবেন? তো ওরা বলে, তাহলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব। আমি শরীক হব না। রাসূল বলছেন, তোমরা ইমামকে যে অবস্থায় পাও, ওই
অবস্থায় শরীক হয়ে যাও। এখন

তোমরা কী করবে? তারা বলে ঠিক আছে, শরীক হয়ে যাব। কিন্তু যেহেতু আমি ফাতিহা পড়তে পারিনি তাই এটিকে রাক'আত ধরব না। আমরা বলি–না, তা হবে না। কারণ রাসূল বলে গেছেন, তুমি যদি রুকু পাও তাহলে রাক'আত পেয়েছ। রুকু ধরবে না, রাক'আত ধরবে না? এর কী অর্থ? এটা তো হাদীসের বরখেলাফ। তো সব বিষয়ে হাদীস দুটি। আমাদের ইমাম সাহেব দুটির ব্যাপারেই ফয়সালা দিয়েছেন। আমরা একটিও বাদ দিচ্ছি না। আর ওরা একটির ওপর আমল করছে,
আরেকটি বাদ দিয়ে দিচ্ছে। ওরা "হাদীস অস্বীকারকারী"!
তারা বলে, আমরা বুখারী মানি। আসলে ওরা বুখারী মানে না। তাহলে স্ত্রীর সাথে মিলন করে বীর্যপাত না হলে ওরা কি গোসল না করে ওজু করে? ওরা কি জিলহজের ১১ ও ১২ তারিখে রোজা রাখে? ওরা কি তিন তালাকে তিন তালাক দেয়? এই যে তিন তালাকে তিন তালাক দিল না। এতে ছেলে-সন্তান কী হবে? হারামজাদা হয়ে যাবে। ওরা এ রকম কাণ্ড করে। যার কারণে ওদের
ছেলে-সন্তান চরম বেয়াদব হয়...!
ওরা বলে, "যতক্ষণ পায়ুপথে বায়ু বের হয়ে আওয়াজ না হবে, ততক্ষণ ওজু ভাঙে না...।" যা সম্পূর্ণ ভুল ও হাদীসের বরখেলাফ। তাই তাদের পেছনে ইক্তেদা করা যাবে না; কারণ তারা বে-ওজু নামায পড়ায়। অথচ বায়ু বের হওয়ার জন্য হাদীসে কোনো শর্ত নেই। বায়ু বের হলেই ওজু ভেঙে যাবে, নামায হবে না। আর ওরা ফাতওয়া দেয় কী? যে বায়ু বাহির হয়ে আওয়াজ না হলে ওজু ভাঙে না। তাদের কি নামায হয়? ওদের পেছনে কি ইক্তেদা করা যাবে? ওজু না থাকায় ওদের নামায হয় না। ওদের পেছে ইক্তেদা করা যাবে না। ওদের নিকট সুন্নীদের মেয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না। এবং কোনো সুন্নী মুসলমানের জন্য ওদের মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হবে না। এতে দ্বীন-ধর্ম সব নষ্ট হয়ে যাবে।
আল্লাহ তা'আলা সকলকে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর কায়েম থাকার তাওফীক দান করুন...। আমীন।
আহলে হাদীস বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার তিনটি কিতাব পড়ুন

(ক) হাদীসে রাসূল
(খ) তুহফাতুল হাদীস
(গ) মাযহাব ও তাকলীদ।

(সমাপ্ত)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

স্থানীয় ভাষায় জুমু'আর খুতবা : শরীয়ত কী বলে?

মুফতী মুহাম্মাদ শফী কাসেমী

আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা প্রদান করা বিদ'আত ও মাকরূহে তাহরীমি। কারণ তা রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর সর্বযুগে সর্বসম্মত আমলের পরিপন্থী।

জুমু'আর নামাযের আগে নবী করিম (সা.) দুটি খুতবা দিতেন। দুই খুতবার মাঝখানে অল্প সময় বসতেন। (মুসলিম শরীফ, ১/২৮৩, হাদীস-১৪২৬) রাসূল (সা.)-এর উভয় খুতবা সর্বদাই আরবী ভাষায় হতো। অতএব, দুই খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

জুমু'আর দিন খুতবার আগে স্থানীয় ভাষায় যে দ্বীনি আলোচনা করা হয়, তা খুতবায়ে মাসনুনাহ বলে গণ্য হবে না। কিছু কিছু মানুষ এই দ্বীনি আলোচনাকেও জুমু'আর খুতবা মনে করেন। তাঁদের ধারণা সঠিক নয়।

খুতবা আরবী ভাষাতেই হতে হবে, তার প্রমাণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

'খুতবা আরবী ভাষায় দেওয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনসহ আজ পর্যন্ত উম্মতের ধারাবাহিক আমল। অতএব তার বিপরীত আমল করা বিদ'আত ও মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয। উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) তাঁর রচিত মুয়াত্তায়ে মালেকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুসাফফায় উল্লেখ করেন–

لما لاحظنا خطبة النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاء ه رضى الله عنهم و هلم جرا فنجد فيها وجود اشياء ، منها الحمد والشهادتان والصلاة على النبى عليه السلام والامر بالتقوى وتلاوة اية والدعاء للمسلمين والمسلمات وكون الخطبة عربية.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.), খুলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন এবং পরবর্তী যুগের ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে দ্বীনের খুতবাসমূহ লক্ষ করলে দেখা যায় যে তাঁদের খুতবায় নিম্নের বিষয়গুলো ছিল। যথা :

আল্লাহ তা'আলার হামদ, শাহাদাতাইন (অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা) রাসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ, তাকওয়ার আদেশ, পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, মুসলমানদের জন্য দু'আ। তাঁরা সকলেই আরবী ভাষায় খুতবা দিতেন। গোটা মুসলিম বিশ্বের বহু অঞ্চলের ভাষা আরবী নয়, তবুও সর্বত্র আরবী ভাষায়ই খুতবা দেওয়া হতো। (মুসাফফা, ১/১৫৪)

এমন মনে করা ঠিক নয় যে, রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের যুগে অনারবী ভাষায় খুতবা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ যামানায় দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا

অর্থ : 'আর আপনি দেখবেন লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।' (সূরা নাছর, আয়াত-২)

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে বিভিন্ন ভাষার মানুষ নামায আদায় করত।

খুতবা ছাড়া দ্বীনি শিক্ষার অন্য কোনো মাধ্যমও তেমন ছিল না। তার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্য ভাষায় খুতবা অনুবাদের ব্যবস্থা করেননি। তদ্রূপ সাহাবীগণের যুগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বুখারী শরীফ ১/১৩ তে বর্ণিত আছে, তিনি নিজের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দোভাষী ব্যবহার করতেন। তবুও তিনি স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেওয়া বা খুতবার অনুবাদের ব্যবস্থা করেননি।

খুতবাকে দুই রাক'আত নামাযের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তাই নামাযে যেমন ক্বেরাত আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় আদায় করা যায় না, খুতবাও আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় দেওয়া যাবে না। আল্লামা আবু বকর ইবনে শাইবা (রহ.) উল্লেখ করেন–

حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام بن أبى عبد الله عن يحيى بن أبى كثير قال حدثت
عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين

অর্থ: হযরত উমর (রা.) বলেন, জুমু'আর খুতবাকে দুই রাক'আত নামাযের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, হাদীস-৫৩২৪)

অন্যত্র হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

حدثنا وكيع عن الاوزاعى عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال كانت الجمعة اربعا فجعلت ركعتين من أجل الخطبة

অর্থ: হযরত উমর (রা.) বলেন, জুমু'আর নামায চার রাক'আত ছিল। এরপর খুতবার কারণে দুই রাক'আত করা হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, হাদীস-৫৩৩১)

ইমাম বায়হাকী (রহ.) আস-সুনানুল কুবরা গ্রন্থে ৫৭০৩ নং হাদীসে উল্লেখ করেন–

كانت الجمعة اربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين

অর্থ : জুমু'আর নামায চার রাক'আত ছিল। খুতবাকে দুই রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

'পবিত্র কোরআনে খুতবাকে যিকর বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

অর্থ : হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনগণ লিখেছেন, এখানে 'যিকর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'খুতবা'।

এ ব্যাপারে নিম্নে কয়েকটি তাফসীরের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো :

১। তাফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৭০২-এ উল্লেখ আছে–

والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة

অর্থ: আল্লাহর যিকর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খুতবা ও নামায।

২। ইমাম রাযী (রহ.) আত-তাফসীরুল কাবীর গ্রন্থে লেখেন– (খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩০)

الذكر هو الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير

অর্থ : অধিকাংশ মুফাসসিরগণের নিকট যিকর দ্বারা খুতবা উদ্দেশ্য।

৩। আহকামুল কোরআন খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৯৬-এ বর্ণিত আছে–

ويدل على ان المراد بالذكر ههنا الخطبة، ان الخطبة هى اللتى تلى النداء وقد امر بالسعى اليه

অর্থ : যিকর থেকে যে খুতবাই উদ্দেশ্য, তার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আযান হলে যিকিরের দিকে আসো। আর আযানের সাথে সাথে খুতবাই প্রদান করা হয়।

৪। তাফসীরে ইবনে কাসীরে খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৫৬-এ উল্লেখ আছে–

فان المرادمن ذكر الله الخطبة

অর্থ : আল্লাহর যিকর দ্বারা খুতবাই উদ্দেশ্য।

হাদীস শরীফেও খুতবাকে 'যিকর' বলা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাতের গোসল করে সর্বপ্রথম রওনা হলো, সে যেন একটি উট কোরবানী করল। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যক্তি উপস্থিত হলো, সে যেন একটি গরু কোরবানী করলো। তৃতীয় নম্বরে যে উপস্থিত হলো, সে যেন একটি বকরি কোরবানী করল। চতুর্থ নম্বরে যে ব্যক্তি উপস্থিত হলো, সে যেন একটি মুরগি সদকা করল। পঞ্চম নম্বরে যে উপস্থিত হলো, সে যেন একটি ডিম সদকা করল। এরপর যখন ইমাম (খুতবার) জন্য বের হয়ে আসেন, ফেরেশতারা উপস্থিত হন, তাঁরা মন দিয়ে যিকর (খুতবা) শ্রবণ করেন। (বুখারী শরীফ, ১/১২৭, হাদীস-৮৩২, মুসলিম শরীফ, হাদীস-১৪০৩, তিরমিযী শরীফ, হাদীস-৪৫৯, নাসায়ী শরীফ, হাদীস-১৩৭১, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-২৯৭)

ফুকাহায়ে কেরামও খুতবাকে যিকর বলেন। যেমন শামছুল আইম্মা সারাখছী (রহ.) বলেন–

ولنا ان الخطبة ذكر

অর্থ : আমাদের নিকট খুতবা একটি বিশেষ যিকর। (আল-মাবসুত, ২/৪২)

যখন এ কথা প্রমাণিত যে, খুতবা একটি বিশেষ যিকর, আর যিকর আরবী ভাষাতেই হতে হয়, তাই খুতবাও আরবীতেই হতে হবে।

'খুতবা নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণেই হাদীস শরীফে খুতবার জন্য এমন কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুধু নামাযের জন্য প্রযোজ্য।

যেমন :

ক) নামাযের জন্য যেমন ওয়াক্ত নির্ধারিত রয়েছে, খুতবার জন্যও ঠিক ওই ওয়াক্তই নির্ধারিত। ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে বা পরে খুতবা দিলে তা সহীহ হয় না।

খ) জুমু'আর নামাযে যেমন ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত রয়েছে, জুমু'আর খুতবার জন্যও তদ্রূপ ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত রয়েছে।

গ) নামাযের জন্য যেমন পবিত্রতা শর্ত, তদ্রূপ খুতবার জন্যও পবিত্রতা জরুরি। ওজুবিহীন খুতবা দেওয়া মাকরূহ। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে নাজায়েয।

ঘ) নামাযের পূর্বে ইকামত দিতে হয়, তদ্রূপ খুতবার পূর্বে আযান দিতে হয়।

ঙ) নামাযের মধ্যে সালাম-কালাম করা যায় না। খুতবাতেও সালাম-কালাম করা যায় না। নামাযে কারো হাঁচির উত্তর দেওয়া যায় না, সালামের জবাবও দেওয়া যায় না। তেমনিভাবে খুতবাতেও কারো হাঁচি ও সালামের জবাব দেওয়া যায় না।

চ) নামায যেমন দাঁড়িয়ে পড়া হয়, খুতবাও তেমনি দাঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ আছে, ইমাম সাহেব যখন খুতবা দেওয়ার জন্য হুজরা থেকে বের হবেন, তখন কোনো নামায ও কথাবার্তা বলা নিষেধ। (আবু দাউদ শরীফ, ১১১২)

অন্যত্র বর্ণিত আছে, জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা প্রদানকালে যদি কেউ অন্যকে বলে, চুপ করো, তবে সেটাও অন্যায় হবে। (নাসায়ী শরীফ, হাদীস-১৪০১, আবু দাউদ হাদীস-১১১২)

যেহেতু খুবতা নামাযের মতো, অতএব নামাযে যেমন আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা জায়েয নেই, তদ্রূপ খুতবার মধ্যেও আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

'খুতবা ইসলামের একটা প্রতীক। অর্থাৎ আযান, ইকামত, নামায, তাকবীর এগুলো যেমন ইসলামের প্রতীক, তেমনি খুতবাও একটি প্রতীক। আযান-ইকামত যেমন অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না, তেমনি খুতবাও অন্য ভাষায় দেওয়া যাবে না।

'আরবী ভাষা মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষা শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া। কারণ কোরআন-হাদীস বোঝা আমাদের কর্তব্য। কোরআন-হাদীস বোঝার জন্য আরবী জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই আরবী শেখার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরবীতে খুতবা দেওয়া হয়। একজন আরবী না জানা ব্যক্তির সামনে যখন প্রতি সপ্তাহে আরবীতে খুতবা দেওয়া হবে, তখন তার সামনে নিজের অক্ষমতা বারবার স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। যা তাকে আরবী শিখতে উৎসাহিত করবে।

'আরবী ভাষায় খুতবা জরুরি হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো, পুরো মুসলিম উম্মাহর মাঝে তাওহীদ ও ঐক্যের প্রতীক হলো খুতবা। মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক, প্রতি জুমু'আয় আরবী ভাষার খুতবা তাদের মাঝে সেতু বন্ধনের কাজ করবে। সব জায়গায় যদি নিজ নিজ মাতৃভাষায় খুতবা হতে থাকে, তাহলে কোনো এলাকায় আগন্তুক ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ের মত ইবাদতেও নিজেকে একজন অপরিচিত ভাবতে থাকবে।

'খুতবা আরবীতে হওয়ার আরেকটি হিকমত হলো, ভাষার প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান। শাইখুল ইসলাম আল্লামা হাফেয ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর কিতাব 'ইকতেযা-উস-সিরাতিল মুসতাকীম' ১/৪২৪-এ উল্লেখ করেন–

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر فى العقل ، والخلق ، والدين تأثيرا قويا بينا،

অর্থ: জেনে রাখা উচিত যে, কোনো বিশেষ ভাষায় অভ্যস্ত হওয়া চিন্তাচেতনা, আখলাক-চরিত্র ও দ্বীন-ধর্মের মধ্যে শক্তিশালী ও স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

এ জন্য রাজা-বাদশাহগণ তাঁদের দেশে নিজ নিজ ভাষার প্রচলন করার চেষ্টা করেন। আর সে কারণেই যেসব এলাকা সাহাবীদের হাতে বিজিত হয়েছে, সেগুলো আজ মামালেকে আরাবিয়া তথা আরব দেশ বলে গণ্য হয়ে আসছে। কেননা, সেসব দেশে যখন সব বিষয়ে আরবী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তখন সবাইকে বাধ্য হয়েই আরবী ভাষা শিখতে হয়েছে। সাহাবীদের পরে যেসব এলাকা বিজিত হয়েছে, সেগুলো আরব দেশ বলে গণ্য হয়নি।

সাহাবীগণ তাঁদের শত বছরের ইতিহাসে কোনো দিন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেননি। সাহাবীদের যুগে বহু অনারব দেশ বিজয় হয়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বে এসেছিল, যেগুলোর অনেক স্থানেই ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। তখন দ্বীনের

তাবলীগ ও মাসলা-মাসায়েলের তালীম দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভাষায় জুমু'আর খুতবা প্রদানের প্রয়োজন ছিল বেশি। কেননা, খুতবা ছাড়া মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কোনো কিতাবাদী রচিত হয়েছিল না। তখন বেশ কিছু সাহাবী ও তাবেয়ী অনারবী বিভিন্ন ভাষায় অত্যন্ত দক্ষও ছিলেন। তবুও তাঁরা আরবী ভাষাতেই খুতবা প্রদান করতেন। এমনকি হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর মাতৃভাষা ফারসী হওয়া সত্ত্বেও পারস্যের এক যুদ্ধে সেনাপতি থাকাকালে সেখানকার ফারসী ভাষাভাষী লোকদের সাথে আরবীতে কথা বলেছেন। দোভাষী তার অনুবাদ করেছে। একপর্যায়ে দোভাষীর অনুবাদ যথার্থ না হওয়ার আশংকায় হযরত সালমান ফারসী (রা.) নিজেই কোরআন শরীফের একটি বাক্যের ফারসী অনুবাদ করেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-১৫৪৮)

এ হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীগণ শুধুমাত্র জুমু'আর খুতবাই নয়, বরং যে সকল স্থানে বিপক্ষের নিকট মুসলমানদের মর্যাদা প্রকাশের বিষয় জড়িত ছিল, সেখানে আরবী ভাষাই ব্যবহার করতেন।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের যামানা হতে আজ পর্যন্ত উম্মতের ধারাবাহিক আমল হলো আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করা। তাঁরা কখনো আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেননি। সুতরাং আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া বা আরবীতে খুতবা পাঠ করে নামাযের পূর্বে অন্য ভাষায় তার অনুবাদ করা বিদ'আত ও নাজায়েয। যেমন নিম্নোক্ত কিতাবগুলোতে উল্লেখ আছে–

ولا شك فى ان الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبى والصحابة، فيكون مكروها تحريما

অর্থ: অনারবী ভাষায় খুতবা দেওয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিক সুন্নাত আমলের পরিপন্থী। অতএব, তা মাকরূহে তাহরীমি হবে। (উমদাতুর রিআয়া, ১/২০০, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১২/৩৫৮, আহসানুল ফাতাওয়া, ৪/১৫০, জাওয়াহিরুল ফিক্বহ, ১/৩৫২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে নেই এমন বিষয় ধর্মীয় বিষয় বলে আবিষ্কার করে, তা পরিত্যাজ্য। (বুখারী শরীফ, হাদীস-২৪৯৯, মুসলিম শরীফ, হাদীস-৩২৪২, ইবনে মাযাহ শরীফ, হাদীস-১৪, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৩৯৯০)

হযরত ইরবায বিন সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থ : তোমাদের মাঝে আমার পর যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতভেদ দেখবে। তখন তোমাদের ওপর আমার এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা জরুরি। সেটিকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে। আর সাবধান থাকবে, নব উদ্ভাবিত ধর্মীয় বিষয় থেকে। কেননা, ধর্ম বিষয়ে প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-১৬৫২১)

খুতবার পূর্বে বয়ানের শরয়ী হুকুম

প্রথম আযানের পূর্বে বা পরে এবং ছানী আযানের অবশ্যই পূর্বে ওয়াজ-নসীহত করা বৈধ। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে তা প্রমাণিত আছে।

عن عاصم بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، قال :كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقاب نعليه فى ذراعيه ثم يقبض على رمانة المنبر ، يقول :قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ، قال محمد صلى الله عليه وسلم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ، ثم يقول فى بعض ذلك : ويل للعرب من شر قد اقترب فإذا سمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

অর্থ : আসেম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) জুতা খুলে

মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে মিম্বর ধরে বলতেন, আবুল কাসেম (সা.) বলেন, মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, সাদেক মাসদুক (সা.) বলেন, ধ্বংস আরবদের জন্য, ওই ফিতনার কারণে, যা নিকটবর্তী...। এরপর যখন ইমাম সাহেবের বের হবার আওয়াজ শুনতেন, তখন তিনি বসে যেতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, ১/১৯০, হাদীস-৩৩৮)

عن أبي الزاهرية ، قال :كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام

হযরত আবদুল্লাহ বিন বুছর (রা.) জুমু'আর দিন প্রথমে ওয়াজ করতেন। যখন খতীব খুতবার জন্য আগমন করতেন, তখন তিনি ওয়াজ বন্ধ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, ১/২৮৮, হাদীস-১০১২)

হযরত তামীম দারী (রা.) হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে খুতবার পূর্বে ওয়াজ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৩১/৩৩১, হাদীস-১৫১৫৭)

কিন্তু সাহাবীগণ কেউ জুমু'আর পূর্বের এ বয়ানকে খুতবা বা খুতবার অংশ গণ্য করতেন না। বরং এরপর দুটি খুতবা দেওয়া হতো।

লা-মাযহাবীদের কিছু যুক্তি ও তার জবাব

স্থানীয় ভাষায় খুতবা প্রদানের ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের নিকট কোরআন-সুন্নাহ হতে কোনোই দলিল নেই। এ ক্ষেত্রে কোরআন ও সহীহ হাদীস ত্যাগ করে তারা কিছু খোড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে। আমরা তা উল্লেখ করে জবাব প্রদান করছি।

তাদের যুক্তি-১ : খুতবা আরবী শব্দ। তার অর্থ বক্তৃতা বা ভাষণ। বক্তৃতা বা ভাষণ যেমন যেকোনো ভাষায় দেওয়া যায়, তদ্রূপ খুতবাও যেকোনো ভাষায় দেওয়া যাবে।

আমাদের জবাব : যুক্তিটি সঠিক নয়। কারণ, শরীয়তের পরিভাষাগুলো শাব্দিক অর্থে বিবেচিত হয় না। বরং শরীয়তে তাকে যে অর্থের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন 'সালাত' আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ নিতম্ব দোলানো, দু'আ করা ইত্যাদি। শাব্দিক অর্থে সালাত আদায় করা গেলে দিনে পাঁচবার নিতম্ব দোলালে বা দু'আ করলেই চলত। কিন্তু এমন কথা কোনো পাগলও বলবে না। বরং শরয়ী অর্থ অনুযায়ী দিনে পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট নিয়মে সালাত আদায় করতে হয়।

তদ্রূপ জুমু'আর খুতবাও শাব্দিক অর্থে শুধু ভাষণ দিলে হবে না। বরং শরয়ী নিয়মে জুমু'আর পূর্বে আরবী ভাষায় দিতে হবে।

তাদের যুক্তি-২ : ওয়াজ বা ভাষণের নাম খুতবা। আর ওয়াজ-নসিহত বা ভাষণ শ্রোতাদের ভাষায় প্রদান করা উচিত।

আমাদের জবাব : উক্ত যুক্তিটির দুটি জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. খুতবাকে ওয়াজ বা বক্তৃতা বলা ভুল। কারণ :

ক) ওয়াজ বা বক্তৃতাকে আরবীতে 'তাযকীর' বলা হয়। অথচ কোরআন-সুন্নায় খুতবাকে 'যিকর' বলা হয়েছে। (সূরা জুমআহ, আয়াত-৯, বুখারী শরীফ, হাদীস-৩০১, মুসলিম শরীফ, হাদীস-৮৫০, নাসায়ী শরীফ, হাদীস-১৩৮৬, ইবনে মাযাহ শরীফ, হাদীস-১০৯২)

খ) ফুকাহায়ে কেরাম খুতবাকে দুই রাক'আত নামাযের স্থলাভিষিক্ত বলেছেন। (বাহরুর রায়েক, ২/১০৮)

গ) খুতবার জন্য যোহরের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত। (বাদায়েউস সানায়ে, ২/২৫৬, আলমগীরি, ১/১৬৮) যদি খুতবা ওয়াজ বা বক্তৃতার নামই হতো, তাহলে জুমু'আর ওয়াক্ত হওয়ার শর্ত হতো না।

ঘ) খুতবা সহীহ হওয়ার জন্য শুধু পাঠ করা শর্ত। কেউ শোনা জরুরি নয়। এমনকি কয়েকজন বধির কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তির সামনে খুতবা পাঠ করা হলেও জুমু'আ সহীহ হবে। (শামী, ৩/১৯০, বাহরুর রায়েক, ২/১৫৭) খুতবা যদি ওয়াজ বা বক্তৃতাই হতো, তাহলে বধির বা ঘুমন্ত ব্যক্তির সামনে খুতবা দিলে সহীহ হতো না।

ঙ) জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবাকে শর্ত বলা হয়েছে। (দুররে মুখতার, ৩/১৯, ফাতহুল কাদীর, ২/৫৫) খুতবা যদি ওয়াজ বা বক্তৃতা হতো, তাহলে নামায সহীহ হবার জন্য তাকে শর্ত বলা যুক্তিহীন।

চ) খুতবা দেওয়ার পর খতীব যদি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যান, আর নামায ও খুতবার মাঝে দীর্ঘ সময় ব্যবধান হয়, তাহলে পুনরায় খুতবা দিতে হয়। যদিও শ্রোতা প্রথমবারের ব্যক্তিরাই হোক না কেন। (বাহরুর রায়েক, ২/২৫৮) যদি খুতবা শুধু ভাষণই হতো, তাহলে একই ভাষণ পূর্বের শ্রোতাদের সামনে আবার বলার কোনোই দরকার ছিল না।

ছ) খুতবা শ্রবণ করা এবং চুপ থাকা ওয়াজিব। যবানে দরূদ শরীফ পড়া, তাসবীহ পাঠ করা, তাকবীর বলা অথবা সালামের উত্তর দেওয়া অবৈধ। খুতবা যদি শুধু ভাষণই হতো, তাহলে সালামের জবাব দেওয়া বা যিকর-আযকার থেকে নিষেধ করা হতো না।

২. কোরআন শরীফকে অনেক আয়াতে ওয়াজ বা নসীহত বলা হয়েছে। (সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৭, সূরা ছাদ, আয়াত-৮৭, সূরা কলম, আয়াত-৫২, সূরা তাকবীর, আয়াত-২৭) তাহলে খুতবার মতো কোরআনকেও নামাযের মধ্যে স্থানীয় ভাষায় পাঠ করা জায়েয হওয়া উচিত। কারণ, আরবী তেলাওয়াত শ্রোতারা অনেকেই বোঝে না। কোনো সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ব্যক্তি কি তা বৈধ বলবে? তেমনিভাবে আযানের মধ্যে ?? حى على الصلاة না বলে 'নামাযের দিকে আসো' বলা উচিত। ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم না বলে 'নামায ঘুম হতে উত্তম' বলা উচিত। কারণ, শ্রোতারা আরবী ভাষায় এ সমস্ত আহ্বান বুঝতে পারে না। অথচ এমন কথা কেউ বলে না।

তাদের যুক্তি-৩ : রাসূলুল্লাহ (সা.) আরবী ভাষায় খুতবা দেননি। বরং মাতৃভাষায় খুতবা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের মাতৃভাষা আরবী ছিল, এ জন্য তাঁরা আরবী ভাষায় খুতবা দিতেন।

আমাদের জবাব : এরূপ যুক্তি মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, উক্ত যুক্তিটি নামায, তেলাওয়াত, আযান ও ইকামতের ব্যাপারেও পেশ করা যেতে পারে। তাহলে কি ওই সব ইবাদতগুলোও রাসূলুল্লাহ (সা.) মাতৃভাষায় আদায় করেছেন বলে যুক্তি দেখিয়ে অন্যরা মাতৃভাষায় আদায় করলে সহীহ হবে? আসলে তাদের এসব যুক্তি ইবাদত নিয়ে খেল-তামাশার অন্তর্ভুক্ত। কোনো ধরনের ইবাদতই আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় গ্রহণযোগ্য নয়। খুতবাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের যুক্তি-৪ : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নামাযে ফারসী ভাষায় ক্বেরাত পাঠকে বৈধ বলেছেন। অতএব, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়াও বৈধ হবে।

আমাদের জবাব : উক্ত যুক্তিটির দুটি জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উক্ত মতামত থেকে তিনি পরবর্তীতে রুজু (মত প্রত্যাহার) করেছেন। সুতরাং তার এই বর্জিত মতামতটি দলিল হিসেবে পেশ করা বোকার পরিচয় দেওয়া। যেমন হেদায়া কিতাবে ১/১০২ উল্লেখ আছে–

وَيُرْوَى رُجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ ، وَالْخُطْبَةُ وَالتَّشَهُّدُ عَلَى هَذَا الاِخْتِلاَفِ

২. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রথম মতামত অনুযায়ী খুতবা অনারবী ভাষায় দেওয়া জায়েয দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মাকরূহে তাহরীমির সাথে জায়েয। (শামী, ২/১৮৩, বাহরুর রায়েক, ১/৫৩৫, তাতারখানিয়া, ২/৭৪, সিআয়া, ২/১৫৫) এ ছাড়া ফিকহে হানাফীর অধিকাংশ কিতাবেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে অনারবী ভাষায় খুতবা জায়েয দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাকরূহে তাহরীমির সাথে জায়েয।

৩. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পূর্ববর্তী মতটির উদ্দেশ্য হলো, অনারবী ভাষায় খুতবা দ্বারা যদি আল্লাহর যিকর আদায় হয়ে যায়, তাহলে জুমু'আহ সহীহ হবে। কিন্তু খুতবার সুন্নাত আরবী ভাষা পরিত্যাগ করার কারণে তা মাকরূহ হবে। যেমন খুতবা দাঁড়িয়ে পবিত্র অবস্থায়, শ্রোতাদের দিকে মুখ করে, পূর্ণ লেবাস পরিধান করে পাঠ করা সুন্নাত। কেউ যদি ওযর-কারণ ছাড়া বসে বসে, কিবলামুখী হয়ে, শুধু সতর ঢেকে খুতবা দেয়, তা জায়েয, কিন্তু সুন্নাত পরিপন্থী ও মাকরূহে তাহরীমি হবে। অতএব, অনারবী ভাষায় খুতবা প্রদান করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পূর্বের মতটিকে দলিল হিসেবে পেশ করা কখনো সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

শ্রোতাদের ভাষায় খুতবার প্রবক্তা বন্ধুগণ নিম্নের সমস্যাটির নকলী বা আকলী সমাধান পেশ করবেন কি?

সমস্যা : একটি মসজিদে জুমু'আর দিন খুতবার সময় দশ জন ইংরেজি ভাষী, দশ জন উর্দূ ভাষী, দশ জন ফারসী ভাষী, দশ জন আরবী ভাষী ও দশ জন বাংলা ভাষী মুসল্লি উপস্থিত রয়েছেন। এমতাবস্থায় খতীব সাহেব শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কোন ভাষায় খুতবা পেশ করবেন?

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৩

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

আর্থিক ডকুমেন্টসমূহ (Bonds, Securitys)

যেহেতু আর্থিক ডকুমেন্টসমূহ সম্পর্কে শরয়ী বিধানের সাথে بيع الدين তথা ঋণ বিক্রি এবং حوالـه হাওয়ালার আলোচনা উপর্যুপরি আসতে থাকবে এবং আর্থিক ডকুমেন্টসমূহের শরয়ী বিধানের ভিত্তিও এর ওপর। তাই মূল বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে بيـــع الـدين তথা ঋণ বিক্রি এবং حوالـه হাওয়ালা বিষয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। পাঠক সমীপে بيـــع الـــديـــن ঋণ বিক্রি ও হাওয়ালার বিভিন্ন পদ্ধতি ও শরীয়া বিধান সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ঋণ বিক্রির প্রবণতা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক আর্থিক ডকুমেন্টের মাধ্যমে এর ব্যাপক রেওয়াজ পেয়েছে। অনেক সময় ডকুমেন্টের ওপর অভিহিত মূল্য (Face value)-এর কমে আর্থিক ডকুমেন্ট (Bonds Securitys) ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। আবার অনেক সময় এর বিপরীত অর্থাৎ Face value-এর অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা হয়।

بيع الدين (Debt Sale) অর্থাৎ ঋণ বিক্রি

এর উল্লেখযোগ্য তিনটি প্রকার রয়েছে (১) بيـع الدين بالدين অর্থাৎ ঋণকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রি (২) بيع الدين ممـن عـليه الدين অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার নিকট ঋণ বিক্রি (৩) بيـع الـدين من غيـر من عليه الدين অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ঋণ বিক্রি। উপরোক্ত প্রকার ক্রয়ের ব্যাখ্যা ও শরয়ী বিধান

(১) بيـع الـدين بالدين অর্থাৎ ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি করা যাকে بيـــع الـكـالـى بالكالى ও বলা হয়। অর্থাৎ বাকিকে বাকির বিনিময়ে বিক্রি করা। এর দুটি পদ্ধতি হবে। (ক) উক্ত লেনদেন স্বয়ং ঋণগ্রহীতার সাথে হবে। (খ) এমনও হতে পারে যে উক্ত লেনদেন স্বয়ং ঋণগ্রহীতার সাথে না হয়ে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে হবে। যথা–রহিম, করিমকে বলল আমি তোমার নিকট থেকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে এক মণ গম ক্রয় করলাম; তবে আমি গমের ওপর এবং তুমি দুই হাজার টাকার ওপর এক মাস পরে কবজ করব। উপরোক্ত উদাহরণে দুই হাজার টাকা রহিমের ওপর ঋণ এবং করিমের ওপর এক মণ গম ঋণ হয়ে গেল। এটাকে بيـع الـديـن بـالـدين তথা Debt Sale বা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি বলা হয়। কেননা এতে উভয় পক্ষে লেনদেন বাকিতে হলো। অথবা রহিম বাঈ সলম পদ্ধতিতে এক টন গম বিক্রি করল; কিন্তু নির্ধারিত সময় আসার পর সে উক্ত গম সরবরাহ করতে অপারগ হলো বিধায় সে ক্রেতাকে বলল আমার জিম্মায় তোমার যে এক টন গম রয়েছে, তা তুমি আমাকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি করে দাও, তবে ওই তিন হাজার টাকা আমি এক মাস পরে পরিশোধ করব। এটাও بيـع الـديـن بـالـديـن তথা Debt Sale-এর অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতিটি জমহুর উলামায়ে কেরামের নিকট নাজায়েয এবং অবৈধ। এ বিষয়ে তাদের পেশকৃত দলিল হলো প্রসিদ্ধ হাদীস

ان النبى ﷺ نهى عن بيع الكالى بالكالى (المستدرك للحاكم ٢/٦٥ رقم الحديث ٢٣٤٢)

অর্থাৎ, মহানবী (সা.) ঋণকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন উক্ত বিষয়ে অনেক উলামায়ে কেরামের মতে ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে।

(২) بيـع الـديـن مـمـن عليـه الدين ঋণগ্রহীতার নিকট ঋণ বিক্রি যথা–রহিমের জিম্মায় করিমের ঋণ রয়েছে বিধায় রহিম ঋণগ্রহীতা করিম ঋণদাতা, এমতাবস্থায় রহিম করিমকে বলে আমার জিম্মায় তোমার যে কর্জ রয়েছে এর বিনিময়ে আমার নিকট থেকে তুমি এই কাপড়টা ক্রয় করো। অথবা করিম বলল, আমি তোমার নিকট যেই ঋণ পাব, তা তোমাকে এই কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছি। এই পদ্ধতিটি জমহুর ফুকহায়ে কেরামের মতে জায়েয। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী (রহ.) লিখেন,

ويـجـوز بيعه (يعنى الدين) ممن عليه لان المانع هو العجز عن التسليم ولا حـاجة الـى التسـليـم هنا ونظيره بيع الـمغصوب انه يصح من الغاصب ولا

অবস্থান হলো ঋণ বিক্রির এই পদ্ধতিটি নাজায়েয। যথা–হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ বিষয়ে উল্লেখ করেন,

لاينبغى للرجل اذا كان له دين ان يبيعه حتى يستوفيه لانه غرر فلا يدرى ايخرج ام لا يخرج (المؤطا ٣٥٤)

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের ঋণ উসূল করবে না, ততক্ষণ তা বিক্রি করা বৈধ হবে না। কেননা এতে "গারার" রয়েছে। সে নিশ্চিত না যে, উক্ত ঋণ আদৌ উসূল হবে কি না? এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন,

ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين لان الدين اما ان يكون عبارة عن مال حكمى فى الذمة واما ان يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التسليم فى حق البائع ولو شرط التسليم على المديون لايصح ايضا لانه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع (بدائع الصنائع ٥/١٤٨)

অর্থাৎ, যিনি ঋণগ্রহীতা নন–ওই রকম ব্যক্তির সাথে ঋণ বিক্রির আকদ (চুক্তি) সংঘটিত হয় না। কেননা আরবী ভাষায় "দাইন" বলা হয় কারো জিম্মায় ওয়াজিব বিধান ও আইনগত মালকে অথবা কাউকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া ও হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে। উভয় পদ্ধতিতে বিক্রেতার পক্ষে হস্তান্তর করা অসম্ভব, যদি এই ধরনের লেনদেনে ঋণগ্রহীতার ওপর হস্তান্তরের শর্তারোপ করা হয় তাহলেও অবৈধ। কেননা এমতাবস্থায় শর্তটা আরোপ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এই শর্তে دين مؤجل অর্থাৎ পরবর্তী নির্ধারিত সময়ে পরিশোধযোগ্য ঋণকে دين معجل অর্থাৎ ত্বড়িত পরিশোধযোগ্য ঋণে পরিণত করা থেকে নিষেধ করেছেন, যাতে ঋণের কিছু অংশ মাফ করা যায়। উক্ত মাসআলাকে ضع وتعجل (অর্থাৎ ত্বড়িত ভিত্তিতে পরিশোধ করো এবং ঋণের কিছু অংশ মাফ পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করো) নামে নামকরণ করা হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে Rebat বলা হয়। তদ্রূপ ঋণগ্রহীতা যদি নিজের ঋণ ঋণদাতার নিকট থেকে ঋণের পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত ثمن مؤجل তথা বাকি ছমনের ওপর ক্রয় করে এটাও সুদ। এটা ام اتقضى تربى" অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করবে নাকি সুদ দেবে এর অন্তর্ভুক্ত। যা হারাম হওয়া পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ রহিম করিমের নিকট এক হাজার টাকা পায়, যা আদায় করা করিমের জিম্মায় ওয়াজিব। এমতাবস্থায় করিম রহিমের নিকট থেকে এক মাস পরিশোধের শর্তে দেড় হাজার টাকা ক্রয় করে নিল। এ ধরনের লেনদেন সুদ হওয়া একেবারেই পরিষ্কার।

(৩) بيع الدين من غير من عليه الدين অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা ব্যতীত তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট ঋণদাতা নিজের ঋণ বিক্রি করা। এটা بيع الدين তথা ঋণ বিক্রির তৃতীয় প্রকার। উক্ত পদ্ধতি জায়েয হওয়া না হওয়া বিষয়ে ফুকহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে হানাফী, হাম্বলী মাযহাবের ফুকহায়ে কেরামের

يصح من غيره اذا كان الغاصب منكرا ولا بينة للمالك (بدائع الصنائع ٥/١٤٨)

উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম। যার ওপর ঋণ রয়েছে তাকে ঋণ বিক্রি করা বৈধ। কেননা অবৈধতার মূল কারণ ছিল হস্তান্তরের অপারগতা। এ ক্ষেত্রে হস্তান্তরের প্রয়োজনই পড়ে না। তবে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যেসব শর্ত অনিবার্য পাওয়া যেতে হয় তা এ ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া যেতে হবে। যথা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো "মবি" তথা বিক্রিতব্য পণ্য বিক্রেতার কবজায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। এই শর্তটি بيع الدين তথা ঋণ বিক্রির উপরোক্ত পদ্ধতিতেও পাওয়া যেতে হবে। তাই তো বাঈ সলমের মধ্যে "মুসলাম ফীহ" তথা যে পণ্যের ওপর সলম করা হয়েছে তা "মুসলাম ইলাইহি" তথা বাঈ সলমের বিক্রেতার কবজায়-নিয়ন্ত্রণে আসার পূর্বে বিক্রি করা নাজায়েয। যেমনটি আল্লামা কাসানী (রহ.) পরিষ্কার উল্লেখ করেন যে,

ولا يجوز بيع المسلم فيه لان المسلم فيه مبيع ولا يجوز المبيع قبل القبض (المرجع السابق)

অর্থাৎ, মুসলাম ফীহ বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা মুসলাম ফীহ মবী। মবী কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নেই। তদ্রূপ ঋণ এবং এর বিনিময় উভয়টা সুদ সম্পর্কীয় হয় এমতাবস্থায় উক্ত লেনদেন জায়েয হওয়ার জন্য সুদ সম্পর্কীয় পণ্যের লেনদেনবিষয়ক শর্তসমূহ পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া যেতে হবে। এর ফলে

করা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির ওপর, যিনি বিক্রেতা নন। তাই এই শর্তটি ফাসিদ হবে, ফলে ক্রয়-বিক্রয়টিও ফাসিদ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ কাজী আবু ইয়া'লা (রহ.) বলেন,

واختلف فى بيع الدين ممن هو عليه فنقل ابوطالب المنع ونقل منه جواز ذلك ولا تختلف الرواية انه لا يجوز بيعه من غير من هو فى ذمة (كتاب الروايتين والوجهين لابى يعلى ١/٣٥٧)

অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতার নিকট ঋণ বিক্রির বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–আবু তালিব অবৈধ হওয়া উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বৈধ হওয়াটাও উল্লেখ রয়েছে; তবে ঋণগ্রহীতা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ঋণ বিক্রি নাজায়েয হওয়ার মধ্যে কারো মতানৈক্য উদ্ধৃত নয়। হাম্বলী মাযহাবের আরো একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা মিরদাভী (রহ.) লিখেছেন,

لايجوز بيع الدين المستقر لغير من هو فى ذمته وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب (الانصاف للمرداوى ٥/١١٢)

অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা নন–ওই ধরনের ব্যক্তির নিকট ঋণ বিক্রি অবৈধ। এটাই বিশুদ্ধ মাযহাব। ফুকাহায়ে কেরাম এটাই গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ঋণ বিক্রি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে অবৈধ। তবে উক্ত লেনদেন যদি হাওয়ালা (Transfer) পদ্ধতিতে হয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে বৈধ। হাওয়ালা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো হাওয়ালার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির দিকে হাওয়ালা করা হয়েছে সে দেউলিয়া হয়ে গেলে অথবা হাওয়ালার অস্বীকার করলে (ঋণদাতার কাছে যদি কোনো সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে) ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে তার পাওনা দাবি করতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা যখন নিজের ঋণ বিক্রি করে দেয়, তখন ঋণ ক্রেতা ঋণবিষয়ক সার্বিকভাবে ঋণগ্রহীতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। সুতরাং ঋণগ্রহীতা যদি দেউলিয়া হয়ে যায় অথবা অস্বীকার করে এমতাবস্থায় ঋণদাতা নিজের পাওনা বিষয়ে ঋণ ক্রেতার নিকট রুজু করা বৈধ নয়। এই বক্তব্য দ্বারা বোঝা গেল, বাঈ পদ্ধতিতে "গারারের" উপস্থিতি রয়েছে এবং হাওয়ালা পদ্ধতিতে "গারার" পাওয়া যায় না বিধায় ঋণদাতা হাওয়ালাকারী, অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার নিকট নিজের পাওনা বিষয়ে রুজু করতে পারে।

মালেকী মাযহাব

তাঁদের মতেও মূলত ঋণ বিক্রির উপর্যুক্ত পদ্ধতি নাজায়েয। তবে নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে তাঁরা এই পদ্ধতির অনুমতি দিয়েছেন। শর্তসমূহ নিম্নে পেশ করা হলো।

(১) ঋণগ্রহীতা সশরীরে উপস্থিত থাকা (২) ঋণগ্রহীতা ঋণ স্বীকার করা (৩) ঋণ এমন প্রকৃতির হওয়া, যা কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ। সুতরাং ঋণ যদি খাদ্যদ্রব্য প্রকৃতির হয় তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয, কেননা খাদ্যদ্রব্যকে কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা নাজায়েয। (৪) ঋণের বিনিময় এমন জিনিস দ্বারা হওয়া, যা ঋণের সমজাতীয় নয়। (৫) উক্ত লেনদেন স্বর্ণ-রৌপ্যের না হওয়া।

এ বিষয়ে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা যারকানী (রহ.) লিখেন,

ومنع بيع الدين على الغائب ولو قربت غيبته او ثبت ببينة وعلم ملأه بخلاف الحوالة عليه فانها جائزة--- ومنع بيع دين على حاضر ولو ببينة الا ان يقرو الدين مما يباع قبل قبضه وبيع غير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وليس بين مشتريه ومن عليه عداوة ولا قصدا عناته فلابد من هذه الخمس شروط لجواز بيعه زيادة على قوله يقر (شرح الزرقانى على مختصر خليل ٣/٨٣)

সারমর্ম হলো পূর্বোক্ত শর্তসমূহ।

শাফেয়ী মাযহাব

এ বিষয়ে তাঁদের মাযহাবে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, আল্লামা নববী (রহ.) লিখেন,

اعلم ان الاستبدال بيع لمن عليه دين فاما بيعه لغيره كمن له على انسان مأة فاشترى من آخر عبدا بتلك المأة فلا يصح على الاظهر لعدم القدرة على التسليم وعلى الثانى يصح بشرط ان يقبض مشترى الدين ممن عليه وان يقبض بائع الدين العوض فى المجلس فان تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد قلت الاظهر الصحة (روضة الطالبين للنبووى ٣/٥١٤)

وفى شرح المهذب فاما بيعه لغيره كمن له على رجل مأة فاشترى من

آخر عبدا بتلك المأة ففى صحته قولان مشهوران اصحهما لايصح لعدم القدرة على التسليم والثانى يصح بشرط ان يقبض مشترى الدين ممن هو عليه وان يقبض بائع الدين العوض فى المجلس فان تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد (المجموع شرح المهذب ٩/٣٠٠)

উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম : ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ঋণ বিক্রি করা শাফেয়ী মাযহাব মতেও নাজায়েয। তবে ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসে ঋণের ওপর কবজ করে তাহলে জায়েয। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে উক্ত শর্তের ফলে ঋণ আর ঋণ থাকে না বরং ক্যাশ হয়ে যায়। মোটকথা, শাফেয়ী মাযহাব মতেও ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ঋণ বিক্রি করা নাজায়েয। এই কারণে আল্লামা নববী (রহ.) মিনহাজ গ্রন্থে নাজায়েয হওয়ার মতটাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وبيع الدين لغير من عليه باطل فى الاظهر بان اشترى عبد زيد بمأة له على عمرو (منهاج النووى مع مغنى المحتاج ٢/٧١)

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহদের নিকট ঋণগ্রহীতা ব্যতীত তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট ঋণ বিক্রি নাজায়েয।

"সারাংশ

بيع الدين (Debt sale) তথা ঋণ বিক্রির সর্বমোট তিনটি পদ্ধতি। তন্মধ্যে প্রথম পদ্ধতি জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে নাজায়েয। দ্বিতীয় পদ্ধতি জায়েয। তৃতীয় পদ্ধতি হানাফী, হাম্বলী এবং আধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহগণের মতানুসারে নাজায়েয। তবে মালেকী মাযহাবের ফকীহদের নিকট নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই পদ্ধতি জায়েয। কিন্তু ওই সব শর্ত পূরণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় বিধায় তাদের মাযহাবের সারকথাও উক্ত পদ্ধতি নাজায়েয হওয়া।

(بحوث فى قضايا فقهية معاصرة ٢)

হাওয়ালা (Transfer)

আর্থিক ডকুমেন্টসমূহের আলোচনায় অধিক হারে যেই বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে তা হলো হাওয়ালা। তাই হাওয়ালার সংজ্ঞা ও বাস্তবতা, বিশেষ কিছু পরিভাষা এবং হাওয়ালার শর্ত ও বিধানবিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

হাওয়ালা-(Transfer)-এর সংজ্ঞা।

আভিধানিক অর্থে কোনো জিনিস স্থানান্তরিত হওয়া বা স্থানান্তর করাকে হাওয়ালা বলা হয়।

পরিভাষায় হাওয়ালার সংজ্ঞা–

نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحتال عليه (الدر المختار كتاب الحوالة) نقل الدين من ذمة الى ذمة هو الصحيح (الهندية، كذا فى نهر الفائق ٣/٩٥)

অর্থাৎ, হাওয়ালাকারীর জিম্মা থেকে যার দিকে হাওয়ালা করা হচ্ছে তার জিম্মায় ঋণ স্থানান্তরিত হওয়া।

অর্থাৎ, ঋণ (Debt) হাওয়ালাকারীর জিম্মায় ওয়াজিব হয়। কিন্তু হাওয়ালা করার পরে হাওয়ালাকারীর জিম্মা থেকে ঋণ যার ওপর হাওয়ালা করা হয়, তার জিম্মায় স্থানান্তরিত (Transfer) হয়ে যায় এবং হাওয়ালাকারী দায়মুক্ত হয়ে যায়। এটাই মূলত হাওয়ালা এবং কাফালার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। হাওয়ালার মধ্যে স্থানান্তর হওয়া বিদ্যমান কাফালার মধ্যে সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। অর্থাৎ, কাফালার মধ্যে মূল ঋণগ্রহীতার সাথে কফিলের জিম্মাও সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং কাফালা সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতা ঋণের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না।

হাওয়ালাবিষয়ক বিশেষ কিছু পরিভাষা

মুহীল ঋণগ্রহীতা (Debtor)-কে বলা হয়।

মুহতাল/মুহাল/মুহতাল লাহু/মুহাল লাহু- ঋণদাতা (Creditor)-কে বলা হয়।

মুহতাল আলাইহি/মুহাল আলাইহি তৃতীয় ব্যক্তি (Third person)-কে বলা হয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধকে নিজের জিম্মায় নিয়ে নেয়।

মুহাল বিহি ঋণ (Debt)-কে বলা হয়।

তাওয়া, আভিধানিক অর্থে সম্পদ নষ্ট/নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে বলা হয় তবে শরীয়তে এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) যার ওপর হাওয়ালা করা হয় সে যদি হাওয়ালা অস্বীকার করে এবং এর ওপর শপথ করে বলে যে আমি হাওয়ালা কবুল করিনি। এর ওপর যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুহতাল (Creditor)-এর নিকট কোনো শরয়ী সাক্ষীও না থাকে।

(২) যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে অর্থাৎ, (Third person) সে যদি দেউলিয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

উপরোক্ত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে যদি ঋণদাতা (Creditor) তার ঋণগ্রহীতা (Debtor)-এর নিকট নিজের ঋণের পাওনা তাগাদা না করে তাহলে তার মাল নিঃশেষ বা ধ্বংস হয়ে

যাবে–এটাকে "তাওয়া" বলা হয়।

হাওয়ালার রুকন

হাওয়ালার রুকন কেবলমাত্র ইজাব (Offer) এবং কবুল (Accept)। অর্থাৎ, মুহিলের (Debtor) পক্ষ থেকে ইজাব (Offer) পাওয়া যাওয়া এবং মুহাল আলাইহি (Third person) ও মুহাল (Creditor) উভয়ের পক্ষ থেকে কবুল (Acceptenc) পাওয়া যাওয়া যেমনটা উল্লেখ করেছেন আল্লামা কাসানী (রহ.)–

اما ركن الحوالة فهو الايجاب والقبول الايجاب من المحيل والقبول من المحال عليه والمحال جميعا (بدائع الصنائع للكاسانى كتاب الحوالة ٦/١٥)

হাওয়ালার শর্তসমূহ

হাওয়ালার মধ্যে হাওয়ালার পক্ষত্রয় অর্থাৎ হাওয়ালাকারী (Debtor) যাকে হাওয়ালা করা হচেছ (Creditor), যার ওপর হাওয়ালা করা হচ্ছে (Third person) সবাই বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। সাবালেক হওয়া এবং পক্ষত্রয়ের সমন্বিত সন্তুষ্টি পাওয়া যাওয়া জরুরি। তাই পক্ষত্রয়ের মধ্যে কোনো একটি পক্ষকেই হাওয়ালার ওপর বাধ্য করা যাবে না। যেই জিনিসটি হাওয়ালা করা হচ্ছে তা ঋণ হতে হবে। তাই শরীরী কোনো পণ্য বা বস্তুর হাওয়ালা বৈধ হবে না। ঋণ নির্ধারিত এবং সবার নিকট স্পষ্ট হতে হবে। সুতরাং অনির্ধারিত এবং অস্পষ্ট ঋণের হাওয়ালা জায়েয নেই। যেমনটি আল মা'আয়ীরুশ শরইয়্যাতে উল্লেখ রয়েছে,

يشترط ان يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا قابلا للنقل (المعايير الشرعية ١٠١)

হাওয়ালার প্রকারসমূহ

নিম্নে হাওয়ালার চারটি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে–

(১) হাওয়ালা মুকাইয়্যাদা (শর্তযুক্ত হাওয়ালা)। এতে হাওয়ালাকারীর যার ওপর হাওয়ালা করা হবে, তার জিম্মায় কোনো ঋণ বা কোনো শরীরী বস্তু ওয়াজিব হয় এবং হাওয়ালা এই শর্ত যুক্ত করা হয় যে, যার ওপর হাওয়ালা করা হচ্ছে সে ওই ঋণ বা শরীরী বস্তুর মধ্য থেকেই হাওয়ালাকারীর ঋণ পরিশোধ করবে। এমতাবস্থায় যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সে ঋণ পরিশোধ করলে হাওয়ালাকারীর দিকে রুজু করার প্রয়োজন পড়ে না।

(২) হাওয়ালা মুতলাকা (শর্তমুক্ত হাওয়ালা)। এতে হাওয়ালাকারীর যার ওপর হাওয়ালা করা হচ্ছে, তার জিম্মায় কোনো ঋণ বা শরীরী বস্তু থাকে না বরং পূর্বোক্ত শর্তানুসারে যার ওপর হাওয়ালা করা হয়, সে নিজের সম্পদ থেকে হাওয়ালাকারীর পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে এবং পরবর্তীতে হাওয়ালাকারীর দিকে রুজু করে নিজের পাওনা বিষয়ে।

(৩) হাওয়ালায়ে হাল্লা (তাৎক্ষণিক হাওয়ালা)। অর্থাৎ এই হাওয়ালাতে যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, তার ওপর ঋণ তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হয় পূর্বে থেকে উক্ত ঋণ মেয়াদি হোক বা না হোক। এ ধরনের হাওয়ালায় মেয়াদ রহিত করে দেওয়া হয়।

(৪) হাওয়ালা মুআজ্জালা, যাতে পরবর্তীতে মেয়াদান্তে যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, তার ওপর ঋণ ওয়াজিব হয়। পূর্বে থেকে উক্ত ঋণ মেয়াদি হোক বা না হোক, তবে এই ধরনের হাওয়ালার মাধ্যমে মেয়াদ যুক্ত করা হয়েছে।

(المعايير الشريعة ١٠١)

হাওয়ালার বিধানাবলি–

(১) হাওয়ালার মধ্যে হাওয়ালাকারী নিজে ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (২) এতে যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে (Creditor), যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে এর নিকট নিজের পাওনা চাওয়ার অধিকার অর্জন করে। (৩) যদি যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে, সে যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে তার পিছু নেয়, অর্থাৎ তাগাদা দিতে থাকে তা যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সেও হাওয়ালাকারীকে তাগাদা দিতে পারবে।

যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে (Third person) কিভাবে হাওয়ালা থেকে বের হতে পারবে এর পদ্ধতিসমূহ

(১) হাওয়ালা ভেঙে গেলে (২) "তাওয়া,, এর অবস্থায় (৩) যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সে ঋণ পরিশোধ করে দিলে (৪) যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে (Creditor), যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে Third person কে ঋণ, অর্থাৎ যা হাওয়ালা করা হয়েছিল, তা হেবা (Gift) করলে। (৫) যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে, সে ঋণগুলো যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, তাকে সদকা করে দিলে (৬) যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে, সে মৃত্যুবরণ করলে এবং যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সে তার ওয়ারিশ হলে।

كل ذلك مأخوذ من بدائع الصنائع للكأسانى

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৯

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

ফাতওয়া প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন

ইসলামে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ আমল ফিকহ শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্ম থেকে কবরে দাফনসহ যাবতীয় আমল ফিকহ শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে। ঈবাদত ছাড়াও লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এককথায় একজন মুসলমানের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়গুলো এমন যে এ ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ব্যতীত কোনো মতামত দেওয়া নিতান্তই বোকামি। আর যারা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এ বিষয়ে কোনো মতামত দিতে গেলে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। রাসূল বলেছেন,

من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتاً فى جهنم ، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره فقد خانه

"যে ব্যক্তি এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, তবে সে জাহান্নামে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করল। আর যাকে ইলম ব্যতীত ফাতওয়া প্রদান করা হলো, এর গোনাহ ফাতওয়া প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন বিষয়ে পরামর্শ দিল, যার বিপরীত বিষয়ের মাঝে সে কল্যাণ দেখছে, তবে সে তার সাথে প্রতারণা করল।"

[মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী শরীফ]

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে আবী লাইলা (রহ.) বলেছেন,

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : أدركت فى هذا المسجد (مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم احد يسأل عن حديث أو فتيا إلاّ ودّ ان أخاه كفاه ذلك .وفى لفظ آخر : كانت المسالة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر، ويردها الآخر حتى ترجع الى الذى سأل عنها أول مرة.

"তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহ.) বলেন, আমি এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ১২০ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের কাউকে যখন কোনো হাদীস বা ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হতো, প্রত্যেকেই পছন্দ করতেন, তাঁর আরেক ভাই এর উত্তর প্রদানে যথেষ্ট। তিনি অন্য বর্ণনায় বলেছেন,

"তাঁদের নিকট যখন মাসআলা পেশ করা হতো, তখন তিনি আরেকজনের কাছে সেটা পাঠাতেন, অতঃপর তিনি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন, এভাবে অবশেষে প্রথমে যাঁর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর নিকট ফিরে আসত।"

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে অন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা আছে কি না, সেগুলো জিজ্ঞেস করতেন।

[আল-ইনসাফ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.), পৃষ্ঠা-১৮]

হযরত উমর (রা.) কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে বদরী সাহাবীদেরকে একত্র করে তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান দিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

إن كل من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عنه لمجنون"

"যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সকল বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করে, সে অবশ্যই পাগল।"

এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم

"ফাতওয়া প্রদান করতে উদ্যত হওয়াটা কম ইলমের কারণেও হতে পারে, আবার অধিক ইলমের কারণেও হতে পারে। অতএব যখন কারও ইলম কম থাকে, তখন তাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়, না জেনে সে সকল বিষয়ে সমাধান দেয়।

তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রহ.) বলেন–

لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول بلا علم

"অজ্ঞতাবশত কথা বলার চেয়ে কোনো ব্যক্তির জন্য মূর্খ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।"

[আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনু মুফলিহ্ (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৫]

আল্লামা ইবনে ওহাব (রহ.) বলেন,

وعن ابن وهب قال :سمعت مالكاً يقول :وذكر قول القاسم :لأن يعيش الرجل جاهلاً خير له من أن يقول

على الله مالا يعلم ، فقال مالك :هذا كلام ثقيل ثم ذكر مالك أبا بكر الصديق ؛وما خصه الله به من الفضل وآتاه إياه قال مالك :يقول أبو بكر في ذلك الزمان :لا يدرى ولا يقول هذا لا أدرى قال :وسمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول :من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير

"অর্থাৎ আমি ইমাম মালেক (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি কাসেম (রহ.)-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবশত কোনো কথা বলার চেয়ে কোনো ব্যক্তির জন্য অজ্ঞ-মূর্খ থাকাটা অধিক শ্রেয়।" এ কথা উল্লেখ করে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এটি অনেক ভারী কথা। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ফজীলত ও বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে তাঁকে যে ইলম ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, সেটি আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন, "হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে তিনি বলতেন যে, "আমি জানি না। কিন্তু বর্তমানে এরা কেউ বলে না যে আমি জানি না।"

ইবনে ওহাব (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, "বুদ্ধিমান আলেমের কর্তব্য হলো সে যেন বলে দেয় যে, "আমি জানি না"। কেননা এর দ্বারা হয়তো তার জন্য উত্তম কোনো বিষয়ের ব্যবস্থা করা হবে।"

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,

من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً .

"যে ব্যক্তি মানুষকে ফাতওয়া দেওয়ার যোগ্য না হয়েও ফাতওয়া প্রদান করল, সে গোনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য। এবং শাসকদের যারা তাকে এ কর্মে নিয়োগ দেবে তারাও গোনাহগার হবে।"

[ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৬]

হযরত আবু ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا"

"আমি সেই যুগে দেখেছি, যখন এক ব্যক্তি কোনো একটি বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করত, তখন একজন-আরেকজনের নিকট প্রেরণ করত। অবশেষে লোকটি সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.)-এর মজলিশে এসে উপনীত হতো। ফাতওয়া প্রদানে তাদের অপছন্দ থাকায় মানুষ তখন এটি করত।

وعن مالك :قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبى عبد الرحمن فوجده يبكى فقال له :ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له : أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال :لا ولكن أستفتى من لا علم له ، وظهر فى الإسلام أمر عظيم قال ربيعة :وبعض من يفتى ههنا أحق بالسجن من السراق

হযরত ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে জনৈক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যে সে হযরত রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহ.)-এর নিকট গিয়ে দেখল যে তিনি ক্রন্দন করছেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কী কারণে ক্রন্দন করছেন? আপনার ওপর কি কোনো মুসিবত আপতিত হয়েছে? রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন, আমি অযোগ্য লোকের নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেছি। ইসলামের মাঝে মারাত্মক একটি জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি বলেন, "বর্তমানে যারা ফাতওয়া দেয়, তাদের কেউ কেউ চোরদের চেয়েও বেশি জেলে আবদ্ধ থাকার যোগ্য।"

রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান মদীনার বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। এবং হাফেজে হাদীস ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মালেক (রহ.) ফিকহ শিখেছেন। তিনি ১৩৬ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় শতকে যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন, তবে আমাদের সময়ের অজ্ঞ-মূর্খদের যুগে কী বলা হবে?

এ প্রসঙ্গে আহমাদ বিন হামদান হারানী (রহ.) [মৃত্যু-৬৯৫ হি.] লিখেছেন–

فكيف لو رأى ربيعة زماننا هذا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملى لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم فى ذلك وما عليهم ، فمن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم ، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الإسلام

"যদি রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান আমাদের এ সময়টি দেখতেন? তিনি যদি বর্তমান সময়ের অজ্ঞ লোকদের ফাতওয়া প্রদানের অবস্থা প্রত্যক্ষ

করতেন? নিজেদের অযোগ্যতা-অনভিজ্ঞতা, নিকৃষ্ট চারিত্রিক অবস্থা, অভ্যন্তরীণ কলুষতা, লৌকিকতা ও প্রশংসাপ্রিয়তা এবং পূর্ববর্তী গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও তাদের নিকট অজ্ঞ লোকদের ভিড় তাদেরকে জরাগ্রস্ত করেছে, ফলে তারা তাদের গ্রহণীয়-বর্জনীয় সকল বিষয় পরিত্যাগ করেছে; অথচ তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা নিবৃত্ত হয় না, তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা সতর্ক হয় না। সুতরাং কেউ ফাতওয়া, বিচার কিংবা পাঠদানের যোগ্য না হয়েও যদি সে কাজে অগ্রসর হয়, তবে সে গোনাহগার হবে। এ ধরনের বিষয় যদি তার নিকট থেকে বারবার প্রকাশ পেতে থাকে অথবা সে যদি এর ওপর অটল থাকে, তবে সে ফাসেক হয়ে যাবে। এ ধরনের ব্যক্তির কোনো কথা, ফাতওয়া এবং কোনো ফয়সালা গ্রহণ করা জায়েয নয়। এটি ইসলামের শাশ্বত বিধান।"

[সিফাতুল ফাতওয়া, পৃষ্ঠা-১১-১২]

আহমাদ ইবনে হামদান (রহ.) মৃত্যুবরণ করেছেন ৬৯৫ হিজরি সনে। অর্থাৎ এখন থেকে ৭০০ বছর পূর্বে তিনি এ কথাগুলো বলেছেন। সুতরাং বর্তমান যুগের যে কী করুণ অবস্থা, তা সহজেই অনুমেয়।

তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন,

"قال حذيفة :إنما يفتى الناس أحد ثلاثة رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق متكلف "قال ابن سيرين :فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا."

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, মানুষকে ফাতওয়া প্রদান করে তিন ব্যক্তির কোনো এক ব্যক্তি–

১. কোরআনের নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।

২. ফাতওয়া প্রদানে বাধ্য আমির বা শাসক।

৩. অথবা নিরেট মূর্খ লোক।

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন, আমি প্রথম দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নই। সুতরাং আমি তৃতীয় ব্যক্তি হতে চাই না।

পূর্ববর্তী বুজুর্গদের স্বভাব ছিল, যখন তাঁদেরকে কোনো ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হতো, তাঁরা যদি এর সুস্পষ্ট উত্তর জানতেন, তখন তা বলে দিতেন। কিন্তু যদি এ বিষয়ে কোনো উত্তর জানা না থাকত, সাথে সাথে বলে দিতেন, আমি জানি না। আর যদি একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরের সম্ভাবনা থাকত, তখন তাঁরা বলতেন, এটি আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার নিকট এটি ভালো মনে হয়। যেমন ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ফাতওয়া প্রদান করলে অনেক সময় বলতেন,

إن نظنُّ إلَّا ظنَّاً وما نحن بمستيقنين

"আমি শুধু ধারণাই রাখি, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত নই।"

১. হযরত আলী (রা.) বলেন,

وابردها على الكبد إذا سئل أحدكم عمَّا لا يعلم، أن يقول :الله أعلم

(تعظيم الفتيا لابن الجوزى/٨١)

"আমার নিকট অধিক প্রশান্তিকর হলো, তোমাদের নিকট কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করে, আর তোমরা সে সম্পর্কে না জেনে থাকো, তবে বলে দেবে, "আল্লাহই ভালো জানেন।"

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন,

إنى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتَّفق لى فيها رأى إلى الآن

"আমি প্রায় ১০ বছর যাবৎ একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তা করছি, এখন পর্যন্ত উক্ত মাসআলায় সমাধানে আসতে পারিনি।"

তিনি আরো বলেন,

ربما وردت على المسألة فأفكر فيها ليالى

"অনেক সময় আমার নিকট মাসআলা পেশ করা হয়, আমি রাতের পর রাত সেগুলো নিয়ে গবেষণা করি।"

এই হলো আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা। এটিকে বর্তমান অবস্থার সাথে একটু তুলনা করুন। টিভি, রেডিও, পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন টক শোতে অবাধে ফাতওয়ার ছড়াছড়ি। প্রত্যেকেই নিজের মতমতো ফাতওয়া দিচ্ছে। যার যা মনে চাচ্ছে, শরীয়তের বিষয়ে অবলীলায় তা বলে দিচ্ছে। শরীয়ত যেন লা-ওয়ারিস সম্পদ!

আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহ.) উত্তম কথা বলেছেন–

لا تَحْسَبِ الفقهَ تَمْراً أَنْتَ آكِلُه
***لَنْ تَبْلُغَ الفِقْهَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

"ফিকহ শাস্ত্রকে তুমি একটি খেজুর মনে করো না যে তা মুখে পুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি কখনও ফিকহ অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি ধৈর্যধারণ ও অধ্যবসায় গ্রহণ করবে।"

তিনি বলেছেন–

إذ لو كان الفقه يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة من مظانها لكان أسهل شىء ولما احتاج إلى التفقه على أستاذ ماهر وفكر ثاقب باهر.

لَو كَانَ هَذَا العِلمُ يُدرِكُ بالمُنى مَا
كُنتَ تُبصِرُ فى البَرِيَّةِ جَاهلا

"কেননা কিতাব দেখে মাসআলা প্রদানের যোগ্যতার নাম যদি ফিকহ হতো, তবে এটি সর্বাধিক সহজ বিষয়

হতো এবং এর জন্য কোনো দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উস্তাদের সংস্পর্শের প্রয়োজন হতো না।" "এই ইলম যদি এমনিতেই অর্জিত হতো, তবে তুমি পৃথিবীতে কোনো অজ্ঞ লোক দেখতে পেতে না।"

বর্তমানে অনেককে দেখা যায়, প্রশ্ন করার পূর্বেই উত্তর প্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শরীয়তের বিষয়ে তাদের এ ধরনের সবজান্তা ভাব কখনও কাম্য নয়। তাদের ভাবখানা এমন যে তারা জানে না, এমন কোনো বিষয় পৃথিবীতে নেই। অথচ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অবস্থা কী ছিল?

হযরত উকবা ইবনে মুসলিম (রহ.) বলেন–

وعن عقبة بن مسلم قال :صحبت عبد الله بن عمر :أربعة وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول :لا أدرى ، ثم يلتفت إلى فيقول :تدرى ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم

"আমি ৩৪ বছর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সংস্পর্শে থেকেছি। তাঁকে যে প্রশ্ন করা হতো, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, "লা আদরি" (আমি জানি না)। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ করে বলতেন, "এরা আমাদের পিঠকে জাহান্নামের সেতু বানাতে চায়।"

[জামেউ বয়ানিল ইলমী ও ফাযলীহি, আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহ.), খ. ২, পৃষ্ঠা-৮৪১]

তাবেয়ী হযরত আতা (রহ.) বলেন–

أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد

"আমি এমন সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাদের নিকট কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে তারা সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে গিয়ে কাঁপত।"

[কোনো ধরনের ত্রুটি হওয়ার ভয়ে কাঁপত]

[মুয়াফাকাত, আল্লামা শাতবী (রহ.), খ. ৪, পৃষ্ঠা-২৮৬]

হযরত সুফিয়ান সাউরী (রহ.) বলেন–

أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا فى المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بداً من أن يفتوا وقال :أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم

"আমি এমন ফকীহদেরকে পেয়েছি, যাঁরা মাসআলা ও ফাতওয়া প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। নিতান্ত নিরুপায় হলে তাঁরা ফাতওয়া প্রদান করতেন। ফাতওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত সেই ব্যক্তি, যে চুপ থাকে, আর এ ক্ষেত্রে যে অধিক কথা বলে, সে হলো চরম মূর্খ।"

[আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহ.), খ. ২, পৃষ্ঠা-৬৬]

হযরত আব্দুল মালিক বিন আবি সুলাইমান (রহ.) বলেন–

سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال : لا أعلم ثم قال :ويل للذى يقول لما لا يعلم :إنى أعلم

"হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রহ.)-কে কোনো একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "আমি জানি না"। অতঃপর তিনি বলেন, সে ধ্বংস হোক! যে জানে না অথচ বলে যে আমি জানি।"

ইমাম মালেক (রহ.)-কে কখনো ৫০টি প্রশ্ন করা হলে তিনি একটিরও উত্তর দিতেন না। তিনি বলতেন–

من أجاب فى مسألة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه فى الآخرة ثم يجيب فيها

"যে ব্যক্তি কোনো মাসআলার সমাধান দিল, উত্তর প্রদানের পূর্বে তার জন্য কর্তব্য হলো, সে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং পরকালে তার কিভাবে মুক্তি হবে, এটি চিন্তা করবে, অতঃপর তার উত্তর প্রদান করবে।"

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন–

ذل وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك

"প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদান ইলমের প্রতি অবমাননা ও লাঞ্ছনা প্রদর্শন।"

এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং এভাবেই যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শরীয়তের বিষয়ে কারো জন্য যেমন সবজান্তা হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ফাতওয়া বা মাসআলা দেওয়ার যোগ্য না হয়েও মাসআলা দেওয়া জায়েয নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে মূর্খ লোকেরাই নিজেদেরকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করে থাকে। এদের সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য–

الجاهل لا يعلم رتبة نفسه ، فكيف يعرف رتبة غيره

"মূর্খ লোকেরা নিজের অবস্থা সম্পর্কেই অবগত নয়, তবে তারা অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে কিভাবে অবগত হবে?"

অতএব, ফাতওয়া বা মাসআলা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে এটি আমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন! আমীন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মোহর

মুহা. শামীম রায়হান
কাকরাইল, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি মুহা. শামীম রায়হান গত ১২/২২/২০১৪ ইং তারিখে উভয় পক্ষের মুরব্বিদের উপস্থিতি ও সম্মতিতে মোহরে ফাতেমী মোহরানা ধার্য করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় এবং সার্বক্ষণিক মনোমালিন্য, তিক্ততা এবং সংসারে অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করায় আমার স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে আর কোনো উপায় থাকে না। এখানে উল্লেখ্য, বিয়ের কথাবার্তার সময় কথা ছিল ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা কাবিন করার। কিন্তু উভয় পক্ষের মতামত নিয়ে বিয়ে পড়ানো হয় মোহরে ফাতেমীতে এবং কাবিন রেজিস্ট্রেশন করানো হয়নি। মেয়ের পিতার আপত্তিতে শরীয়ত মোতাবেক মৌখিক বিবাহ পড়ানো হয়।

এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীকে তালাক দিলে ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা পাবে, নাকি মোহরে ফাতেমী পাবে?

সমাধান :

বিবাহের পূর্বে যদিও দশ লক্ষ টাকা মোহরানা কথা আলোচনা হয়; কিন্তু বিয়ের মজলিসে যেহেতু উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোহরে ফাতেমী ধার্য করে বিয়ে পড়ানো হয়েছে, তাই মোহরে ফাতেমীই স্ত্রীর প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হবে। যার পরিমাণ হচ্ছে ১৫০ ভরি খাঁটি রুপা বা সমমূল্য টাকা। (রদ্দুল মুহতার ৩/১১০, হেদায়াহ ২/৩০৪, ফতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৮/২৬২)

প্রসঙ্গ : কন্ট্রাকটরি

মুফতী শহীদুল্লাহ
দারুল আরকাম মাদ্রাসা, বাক্ষণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি মানুষের সাথে এই মর্মে কন্ট্রাক করে যে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলে আমি সরকারের নিকট থেকে গ্যাসের চুলা এনে দেব। এতে যা খরচ হয় আমার হবে। উল্লেখ্য, চুলা মঞ্জুর করতে সরকারকে দুই হাজার টাকা দিতে হয় আর এক হাজার তার খরচ হয় বাকি দুই হাজার তার লাভ থাকে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি দুই হাজার টাকা সরকারি খাতে জমা দিয়ে কাজ ওকে করে ফেলে। ইতিমধ্যে সরকার চুলার মূল্য দুই হাজার টাকা বৃদ্ধি করে দেয় ফলে চুলার মূল্য গিয়ে দাঁড়ায় চার হাজার টাকা। এখন আমার জানার বিষয় হলো–

১. উল্লিখিত পন্থায় কন্ট্রাক করা সহীহ হবে কি না?

২. সরকার কর্তৃক বর্ধিত দুই হাজার টাকা গ্রাহকের নিকট থেকে নেওয়া যাবে কি না?

৩. যদি দিতে রাজি না হয় তবে কোনো কৌশলে উক্ত দুই হাজার টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

উল্লিখিত পন্থায় কন্ট্রাক করা সহীহ হবে। আর যেহেতু পূর্বেই চুক্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তাই বর্তমান বর্ধিত দুই হাজার টাকা গ্রাহকের নিকট থেকে তাদের সম্মতি ছাড়া কোনো ধরনের কৌশলে নিতে পারবে না। (বুখারী ১/৩০৩, দুররুল মুখতার ২/৯, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল ৭/৩৭৯)

প্রসঙ্গ : মুসাফির

মুহা. আতাউল্লাহ
এয়ারপোর্ট, দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : আমার জন্মস্থান কুমিল্লা এবং সেখানেই আমরা বসবাস করি। ২০১৩ সালে আমি ঢাকায় একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি বিধায় মাসের অধিকাংশ দিন আমার ঢাকাতেই থাকতে হতো। কিন্তু এই বছর আমার মাদরাসাটি পূর্বের স্থান হতে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তাহে প্রথম তিন দিন আমি ঢাকায় থাকি ও শেষ তিন দিন আমি কুমিল্লায় থাকি। এভাবেই নিয়মিত আমার বছর কাটছে। অতএব আমার জানার বিষয় হলো, ঢাকায় আমি মুকিম না মুসাফির? এবং ঢাকাতে আমি জুমু'আর নামায পড়াতে পারব কি না?

সমাধান :

ঢাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর কখনো যদি সেখানে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাতে ধারাবাহিকভাবে ১৫ দিন অবস্থান করে থাকেন তাহলে ঢাকা আপনার জন্য "ওয়াতনে একামত" সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই পরবর্তীতে সপ্তাহে ঢাকায় তিন দিন অবস্থান করলেও আপনি মুকিম বলেই বিবেচিত হবেন। অন্যথায় আপনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। যেহেতু

মুসাফিরের জন্য জুমু'আর ইমাম হওয়া বৈধ, তাই সর্বাবস্থায় আপনি ঢাকায় জুমু'আ পড়তে পারবেন। (বাহরুর রায়েক ২/১৩৬, হেদায়াহ ১/১৪৯, খায়রুল ফতাওয়া ২/৬৮৩)

প্রসঙ্গ : মুসাফির

মুহা. হাবিবুল্লাহ
এয়ারপোর্ট, দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা কিন্তু আমি সপরিবারে কয়েক বছর যাবৎ ঢাকায় বসবাস করছি। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যস্ততার কারণে অধিকাংশ সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করতে হয়। যার দরুন আমি ধারাবাহিকভাবে তিন দিনও ঢাকায় থাকতে পারি না এবং কুমিল্লাতেও না। বিধায় আমার জানার বিষয় হলো ঢাকায় আমি মুকিম না মুসাফির? অনুরূপভাবে কুমিল্লায় আমি মুকিম না মুসাফির?

বিঃদ্রঃ. যদিও বা আমি সপরিবারে ঢাকায় বসবাস করি কিন্তু কুমিল্লায় আমার ঘর আছে এবং স্থাবর সম্পত্তিও রয়েছে। বছরে দুবার-তিনবার সেখানে আমার যাতায়াত হয়।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনি কুমিল্লার নিজ গ্রামে গেলে মুকিম হিসেবে নামায পড়বেন। আর ঢাকায় আসার পর একবার যদি আপনি কমপক্ষে ১৫ দিনের নিয়্যাতে ধারাবাহিকভাবে ১৫ দিন অবস্থান করে থাকেন তবে ঢাকা আপনার জন্য ওয়াতনে একামত হিসেবে গণ্য হবে। যত দিন পর্যন্ত আপনি ঢাকা একেবারে ত্যাগ না করবেন তত দিন পর্যন্ত পূর্ণ নামায পড়বেন। এমতাবস্থায় চট্টগ্রাম বা কুমিল্লায় আসা-যাওয়ার কারণে উক্ত হুকুমে কোনো পরিবর্তন আসবে না। আর যদি কখনো ঢাকায় ১৫ দিন অবস্থান করা না হয়ে থাকে তবে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যাত না করা পর্যন্ত ঢাকায় সর্বদা মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। (ফতহুল ক্বদির ২/১৮, তাবঈনুল হকায়েক্ব ১/৫১৭, খায়রুল ফাতাওয়া ২/৬৮৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুফতী আবুল কাশেম
সাভার, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার ইমাম সাহেবের সাথে মসজিদের জমিদাতাদের একজনের ঝগড়া হয়। এই ঝগড়ার মীমাংসা করার জন্য দীর্ঘ সময় গ্রাম্য সালিসরা চেষ্টা করেন কিন্তু ওই লোকের গোড়ামীর কারণে ফয়সালা করতে সক্ষম হননি। পরিশেষে গ্রামের সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা কেউ এই মসজিদে নামায পড়ব না। বর্তমানে যারা জমি দিয়েছে তাদের দুই ভাই শুধু নামায পড়ে। আর নতুন মসজিদের জন্য আমার দাদা জমি ওয়াক্ফ করেছেন। উক্ত জমিনে মাটি ভরাট করে মসজিদ নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে রেখেছেন। উল্লেখ্য, নতুন মসজিদের জায়গা পুরাতন মসজিদ থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে। এখন জানার বিষয় হলো–

১. এ অবস্থায় নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না?

২. যদি মসজিদ নির্মাণে শরীয়তে কোনো বাধা থাকে তাহলে নতুন ওয়াক্ফকৃত জায়গার হুকুম কী হবে? এই ওয়াক্ফ কি পরিপূর্ণ হয়েছে? হলে এই জমিতে মসজিদ নির্মাণ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যাবে কি না? সবিনয় আরজ এই যে উক্ত মাসআলা দুটির দ্রুত সমাধান দিতে হুজুরের সুমর্জি কামনা করি।

সমাধান :

১. প্রশ্নের বর্ণনা মতে, শুধুমাত্র দুজনের ঝগড়ার জের ধরে জিদের বশীভূত হয়ে পুরাতন মসজিদকে বাদ দিয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে না। যেকোনো উপায়ে মীমাংসায় পৌঁছে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে উক্ত মসজিদেই নামায আদায় করবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৫/২২৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ১৪/৬৩)

২. নতুন মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মিত না হওয়ায় এখনো ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় রয়ে গেছে, বিধায় সে উক্ত জমি যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৬, ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৫৫, আ-পকে মাসায়েল আউর উনকা হল ৩/২৮০)

প্রসঙ্গ : শপথ

মুহা. নজরুল ইসলাম
রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা : জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে শত্রুতাবশত চুরির দায়ে অভিযুক্ত করার লক্ষ্যে এক ব্যক্তির মোবাইল ফোনসেট লুকিয়ে ফেলে। মোবাইলের মালিক তার মোবাইল হারানোর ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তিসহ আরো অনেককেই সন্দেহ করে। তারপর মোবাইলের মালিক অন্য আরেক ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তির হাতে কোরআন শরীফ দিয়ে তাকে কুল্লামার শপথ করানোর উদ্দেশ্যে বলল যে, তুমি বলো আমি কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে সমস্ত মাযহাবের ছাড় ও সমস্ত হীলা বাহানা ছাড়া বলতেছি যে আমি মোবাইল

ফোনসেট নেইনি। এবং এ ব্যাপারে কোনো কিছু জানি না। তারপর মোবাইল লুকানেওয়ালা তার কথামতো এভাবে মুখে উচ্চারণ করল। মুফতী সাহেবের নিকট আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তি এভাবে শপথ করাতে তার শপথ শুদ্ধ হয়েছে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন ।

বিঃদ্রঃ. শপথকারী যেন জীবনে বিবাহ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই তাকে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কুল্লামার কসম করানো হয়েছিল। কিন্তু শপথকারী বিবাহসংক্রান্ত কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করেনি এবং শপথকারী উক্ত বাক্যগুলো বলার আগে-পরে নিঃশব্দে মুখে ইনশাআল্লাহ বলেছে।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কসম করানোর দ্বারা কুল্লামার কসম সংঘটিত হয়নি। তবে মিথ্যা কসম করার কারণে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হবে বিধায় তার জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার করা আবশ্যক। (আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১০/১০৭,)

প্রসঙ্গ : কমিশন

মুহা. মাইন উদ্দিন
মালিবাগ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. আমি একটি গার্মেন্ট বায়িং অফিসে চাকরি করি। কোম্পানির প্রয়োজনে আমরা বিভিন্ন সাপ্লাইয়ার থেকে কাঁচামাল যেমন–সুতা, বোতাম, কাপড়, ইত্যাদি খরিদ করি। বিল পাওয়ার পর তারা আমাদের/আমাকে কিছু টাকা দিতে চায়। আমার জন্য কি তা নেওয়া জায়েজ হবে?

২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার নিজেই সাপ্লাইয়ারের সাথে দরদাম ঠিক করে, আমরা ওই দামেই খরিদ করি তারপর ও সম্পর্কের কারণে সাপ্লাইয়ার যদি আমাকে কিছু টাকা দিতে চায় তা আমার জন্য জায়েয হবে? এই টাকার বিনিময়ে আমি সাপ্লাইয়ারকে কোনো সুবিধা দেইনি অথবা আমি তাদের কাছে কোনো রকম ডিমান্ড করিনি। তার পরও যদি তারা আমার জন্য কিছু টাকা নিয়ে আসে আমার জন্য তা নেওয়া বৈধ? এই টাকা নেওয়ার দ্বারা কোম্পানির কোনো রকম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। সাপ্লাইয়ার তার নিজের লাভ থেকেই আমাকে সম্মান করতে চায়। আমি সাপ্লাইয়ারের সাথে কোনো রকম দরদাম বা আলোচনা করিনি। বায়ার নিজেই দরদাম ঠিক করেছে। আমি শুধু অর্ডার দিয়েছি।

সমাধান :

বায়িং অফিসের বেতনভোগী ক্রয় প্রতিনিধি হয়ে কোনো মাল ক্রয় করার পর সাপ্লাইয়ার থেকে কোনোরূপ কমিশন বা সুবিধাগ্রহণ আপনার জন্য বৈধ হবে না। যদি তারা কোনো কিছু দেয় তা আপনার মালিকের প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হবে। তবে মালিক জানার পর অনুমতি দিলে বৈধ হবে। (সূরা নিসা-২৯, আবু দাউদ ২/৫০৪, ইমদাদুল আহকাম ৪/১৪৪)

প্রসঙ্গ : সিজদায়ে সাহু

মুফতী মুশতাক আহমাদ
খিলগাও, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠক না করে ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পুনরায় বসে বৈঠক করে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করে এতে নামায সহীহ হয়েছে কি না?

সমাধান :

চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক ভুলে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বৈঠক করার প্রয়োজন নেই, সিজদায়ে সাহু দেওয়াই যথেষ্ট। তবে কেউ ফিরে এসে বৈঠক করে নামায শেষে সাহু সিজদা দিলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে নামায হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৮৪, ফাতহুল ক্বদির ১/৪৪৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪২)

প্রসঙ্গ : জায়েয না জায়েয

মুফতী রিজওয়ান
কল্যাণপুর মাদ্রাসা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি রাস্তার ধারে একটি বাচ্চা পায়। বাচ্চাটির বয়স তখন আনুমানিক এক বছর। ছোট হওয়ার কারণে সে বাবা-মায়ের নাম বলতে পারেনি। বাচ্চাটি ওই ব্যক্তির লালন-পালনে বড় হয়। এখন তার বয়স ১৮ বছর। আমার জানার বিষয় হলো ওই ছেলেটি আইডি কার্ড/পাসপোর্ট ইত্যাদিতে বাবা-মায়ের নামের স্থানে পালক বাবা-মায়ের নাম লিখবে, না আব্দুল্লাহ-আমাতুল্লাহর ন্যায় কোনো রূপক নাম লিখবে?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে আপন বাবা-মায়ের স্থানে পালক বাবা-মার নাম ব্যবহার করা বৈধ নয়। তাই প্রশ্নোক্ত পালক ছেলে নিজের বাবা-মায়ের নাম না জানা অবস্থায় আইডি কার্ড/পাসপোর্ট ইত্যাদিতে বাবা-মায়ের নামের স্থানে আব্দুল্লাহ-আমাতুল্লাহর ন্যায় কোনো রূপক নাম লেখার অবকাশ আছে। (আহাকমুল কুরআন ৩/৫২১, আদ্দুররুল মনসুর ১১/৭২৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৭/৬৭৪)

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে

ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকাল : একজন মহান সাধকের বিদায়

মুফতী জামীল আহমদ দা.বা.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দেওবন্দ

মানুষ মাত্রই মরণশীল। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তবুও কিছু কিছু মানুষের মৃত্যু হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায় তা মেনে নিতে কষ্ট হয়, সৃষ্টিজগতে নেমে আসে শোকের ছায়া। তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব হলেন আমার প্রাণপ্রিয় শায়খ ও মুর্শিদ, উস্তাদুল আসাতিযা, অসংখ্য অগনিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মূল চালিকাশক্তি হযরত ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)। তিনি গত ১০-১১-১৫ ইং মোতাবেক ২৮-০১-৩৭ হি. তারিখ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপন রবের সাথে মিলিত হয়েছেন।

انا لله وانا اليه راجعون

এক কবি কত চমৎকার করেই না বলেছেন,

موت اسکی ہے کرے جسکا افسوس
یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کیلئے

তাঁর মৃত্যুতে যুগও অশ্রুসিক্ত হবে। যদিও পৃথিবীতে সবাই এসেছে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করার জন্য। গতকালও যাকে মাদ্দাজিল্লুহু, বারাকাল্লাহ ফি হায়াতিহী, দামাত বরকাতুহুম উপাধিতে স্মরণ করতাম, আজ তার নামের শেষে রহমাতুল্লাহি আলায়হি কুদ্দিসা ছিররুহু লিখতে হচ্ছে। এটাই চিরন্তন বিধান। আমার প্রাণাধিক প্রিয় শায়খকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য উচ্চ গুণাবলি ও ঈমানদারসুলভ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইলম-আমল, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, নীতি-নৈতিকতা, দানশীলতা-বদান্যতা, দয়া-মহানুভবতা, বিনয়-নম্রতা, বিচক্ষণতা-দূরদর্শিতার মূর্ত প্রতীক। সুন্নাতের অনুসরণ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শত্রুতা, মেহমানদের যথোপযুক্ত সম্মান, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আলেম-উলামাদের কদর ও যথাযোগ্য সম্মান করার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ও অগ্রগণ্য। তিনি জ্ঞানের মাতৃক্রোড় দারুল উলূম দেওবন্দে সেই স্বর্ণোজ্জ্বল সময়ে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন, যখন দেওবন্দের জ্ঞানের রবি-শশীদের আলোয় আলোকিত হচ্ছিল পুরো ধরণী এবং আল্লাহ, তা'আলার রাসূলের শব্দ ইথারে ইথারে প্রকম্পিত হচ্ছিল। তিনি এখানকার আলো-বাতাস থেকেই অর্জন করছিলেন ভবিষ্যতের পাথেয়। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সাথে সম্পর্কের ইতিবৃত্ত হযরতের সাথে আমার সম্পর্কের ঘটনাও বড় চিত্তাকর্ষক। এখন আমি তাই শোনাচ্ছি। বাড্ডা, ঢাকার মুফতী জহির আহমদ একজন কর্মঠ ও তরুণ আলেমে দ্বীন। তাঁর দাওয়াতেই আমি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সফরে আসি। তাঁর আরো কয়েকজন সাথী রয়েছেন। তন্মধ্যে মুফতী মুজিবুর রহমান, মুফতী সরওয়ার, মাওলানা বদীউজ্জামান, মাওলানা ফয়সাল প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের সাথে আমি চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট ও নোয়াখালীর অসংখ্য মাদরাসা-জামিয়া জিয়ারত করি। অসংখ্য দ্বীনি ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভেও আমি ধন্য হই। তন্মধ্যে মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী, মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব, সুলতান যওক নদভী, মুফতী নুরুল হাসান, মুফতী আজিজুল হক, মুফতী শফী, মাওলানা জমিরুদ্দীন সাহেব প্রমুখ অন্যতম। তন্মধ্যে একজন বুজুর্গ ছিলেন আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.), যিনি বাংলাদেশে ফকীহুল মিল্লাত নামে সর্বাধিক খ্যাত। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, জামিয়াতুল আবরার ঢাকা, জামীল মাদরাসা বগুড়ার মতো অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠনের তিনি প্রধান পরিচালক। এ ছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর সাথে সাক্ষাৎলাভের ঘটনা আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। আমি আমার মেজবান মুফতী জহির আহমদের সাথে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য–হযরতওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ করা। মারকাযে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো হুইল চেয়ারে উপবিষ্ট শুভ্র-সফেদ জামা

পরিহিত ব্যক্তিত্বের ওপর। সাদা পাগড়ি এবং নূরানী চেহারা দেখে তাঁকে সাক্ষাৎ ফেরেশতা মনে হচ্ছিল। আমি এগিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম এবং মোসাফাহা করলাম। প্রথম সাক্ষাতেই আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আমি হযরতের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তুলব। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তখনো পর্যন্ত আমি জানতাম না হযরতের লেখাপড়া কোথায় এবং তাঁর ইসলাহী সম্পর্ক কার সাথে? প্রথমে আমার ইসলাহী সম্পর্ক ছিল মুজাহেরুল উলূম সাহারানপুরের সাবেক নাজেম মাওলানা আসআদুল্লাহ (রহ.) (মৃ. ১৩৯৯ হি.)-এর সাথে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি কোনো মুরব্বির তালাশে ছিলাম। হযরতওয়ালা (রহ.)-কে দেখে যেন আমার মনের সুপ্ত বাসনাটি উথলে উঠল এবং তখনই হযরতের কাছে বাইআত হওয়ার আবেদন করলাম। প্রত্যুত্তরে হযরত বললেন, বাংলাদেশে আপনি কত দিন অবস্থান করবেন? আমি বললাম, এক সপ্তাহ। তিনি বললেন, চিন্তাভাবনা করে দেখুন! এত তাড়াহুড়োর কী দরকার? অধম বসুন্ধরা থেকে ফিরে নিজের অন্যান্য প্রোগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার ধ্যান ছিল হযরতের প্রতি। কয়েক দিন পর আমি আবার বসুন্ধরায় গেলাম এবং দ্বিতীয়বার হযরতের কাছে বাইআত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। তখন হযরতওয়ালা (রহ.) অত্যন্ত আনন্দ এবং আগ্রহের সাথে আমাকে তাঁর খাদেমদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এরপর আমি জানতে পারলাম, হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন শায়খুল ইসলাম, শায়খুল আরব ওয়াল আজম, কুতবুল আলম সৈয়দ হোসাইন আহদ মাদানী (রহ.) (১২৯৫-১৩৭৭ হি.)-এর অন্যতম শিষ্য। তিনি ১৯৫০ ইং মোতাবেক ১৩৭১ হি. সনে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। সে সময় ছাত্রদেরকে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে নম্বর দিতেন, তখন তাঁর নম্বর ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। বাতেনী জগতে ছিল হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সরব পদচারণ। তিনি ছিলেন থানভী পুষ্পোদ্যানের সর্বশেষ পুষ্প হযরত শাহ আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.) (জ. ১৩৩৯ হি. ১৯২০ঈ, মৃ. ৮ রবিউস সানী ১৪২৬ হি.)-এর প্রথমসারির খলিফা। বাংলাদেশের প্রায় খ্যাতিমান আলেম-উলামা এবং আল্লাহওয়ালারা হয়তো সরাসরি হুজুরের মুরীদ অথবা হুজুরের গুণগ্রাহী-ভক্ত-অনুরক্ত। অনেক জায়গায় হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সাথে খতমে বোখারীতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে হযরতের কয়েকটি তাকরীর তথা আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হয়। হযরতের বয়ান ছিল ইলমী বিষয়াদিতে টইটম্বুর। তাঁর বয়ানে কখনো অপ্রয়োজনীয়-অপ্রাষঙ্গিক আলোচনা শুনিনি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মতো বড় বড় দ্বীনি দরসেগাহে শায়খুল হাদীস হিসেবে পাঠদান করেছেন। আমৃত্যু তিনি অসংখ্য মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান নির্বাহী ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় ওই সব মাদরাসায় গিয়ে হাদীসের দরস দিতেন। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর দরসের গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। ছাত্ররা হযরতের দরসে চাতক পাখির ন্যায় উন্মুখ হয়ে বসত। জটিল এবং কঠিন ইবারত সমাধান করার ক্ষেত্রে হযরতের পদ্ধতি ছিল অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী। জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও হযরতের স্মৃতিশক্তি ছিল ইমাম তিরমিযী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর মতো। হযরতের প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে তুখোড় মেধাবী ও ধীমানরাও হতভম্ব হয়ে যেতেন।

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

হাজার বছর ধরে নার্গিস ফুল কান্না করে তার মাঝে দীপ্তির প্রখরতা নেই কেন! বড় কষ্টে বাগানে প্রদীপ্ত ও ঝলমলে ফুলের আগমন ঘটে। হযরতওয়ালা (রহ.) আলেম-উলামাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে কদর এবং মূল্যায়ন করতেন। প্রত্যেককে তাঁর স্তর অনুযায়ী সম্মান করার পরও বিনয় প্রকাশ করতেন এবং নিজের কমতির কথা অকপটে স্বীকার করতেন। বিশেষত দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত উলামা-মাশায়েখদের প্রতি হযরতওয়ালা (রহ.)-এর আন্তরিকতা ছিল অবর্ণনীয়। তাদের সর্বোচ্চ আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদেরকে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বয়ান করাতেন। প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে তাঁদেরকে মূল্যবান উপঢৌকন দ্বারা বিদায় দিতেন। তাঁদেরকে যথাযোগ্য হাদিয়া দিতে কখনো কার্পণ্য করতেন না। তৎক্ষণাৎ দিতে না পারলেও পরবর্তীতে কাউকে দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। সব বিষয় ও ফনে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর গভীর ব্যুৎপত্তি থাকলেও ফিকহ এবং ফাতওয়ার ময়দানে হযরতের পাণ্ডিত্য ছিল বর্ণনাতীত। তিনি ইজতিহাদের গুণাবলিসম্পন্ন ছিলেন। বাংলার

আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি ফকীহুল মিল্লাত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। বাহ্যিক জ্ঞানের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তিনি ঋদ্ধ ছিলেন। বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বে হযরওয়ালা (রহ.)-এর অজস্র খলিফা রয়েছেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাঁরা জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) উয়ায়ছ করনী (রহ.)-এর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। সুন্নাতের অনুসরণ, শরীয়তের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমল করা ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সুন্নাতের বিপরীতে কাউকে কোনো কাজ করতে দেখলে তিনি মোটেও তা বরদাশত করতেন না। আমি একবার মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সফর করি। সামান্য সর্দির মৌসুম হওয়ায় আমি একটা রঙিন কাপড় পরে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করি। দেখামাত্র হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, আমরা সাদা কাপড়কেই অধিক পছন্দ করি। একবার অধম হযরতের জন্য ইন্ডিয়া থেকে কয়েকটি পাঁচ কল্লি টুপি হাদিয়া নিয়ে আসি। দেখামাত্রই হযরত বললেন, এই সব পাঁচ কল্লি টুপি বাংলাদেশ থেকেই রপ্তানি করা হয়। এরপর বললেন, অন্যদেরকে পাঁচ কল্লি টুপি হাদিয়া দাও আর নিজে দুই কল্লি টুপি মাথায় দাও! তখন আমার মাথায় দুই কল্লি টুপি ছিল। হযরতের এই সাধারণ কথা আমার মধ্যে বিরাট ঝড় তোলে। আমি তৎক্ষণাৎ মারকাযের এক শিক্ষককে বললাম, আমার জন্য একটি পাঁচ কল্লি টুপির ব্যবস্থা করো। তিনি ত্বড়িত গতিতে ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি দুই কল্লি টুপি মাথা থেকে খুলে পাঁচ কল্লি টুপি মাথায় দিলাম। তখন থেকে পাঁচ কল্লি টুপি মাথায় দেওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। দুই কল্লি টুপির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি না হলেও তার প্রতি এখন আর আগ্রহ নেই। এটাকে আমি হযরতওয়ালা (রহ.)-এর তাসাররুফ বা বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে অভিহিত করি। হযরতওয়ালা (রহ.) একবার দেওবন্দ সফরে ছিলেন। ছাত্ররা আবেদন করল হযরত! আমাদেরকে কিছু নসীহত করুন। তখন হযরতওয়ালা (রহ.) তাদেরকে কেবল একটি নসীহত করেন। আর তা হলো মনুষ্যত্বের চাহিদা এবং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যদি গোনাহ করতেই হয় তাহলে গোনাহকে গোনাহ মনে করে করবে। তখন এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন একাকী নির্জনে বসে কথাটির ওপর চিন্তা-ভাবনা করলাম, তখন বুঝতে পারলাম এটি অনেক উচ্চস্তরের নসীহত বরং পয়গম্বরসুলভ নসীহত। অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গোনাহ থেকে বাঁচার কোনো পন্থাই যদি না থাকে তাহলে গোনাহ করার সময় যেন এই ধ্যান-ধারণা থাকে যে, এটা গোনাহ এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী আমল। যদি কেউ গোনাহকে গোনাহ মনে করে করে, তাহলে ভবিষ্যতে তার অবশ্যই তাওবাহ নসীব হবে। পক্ষান্তরে যদি সে গোনাহকে গোনাহও মনে না করে তাহলে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাওবাহ নসীব হওয়া সুদূর পরাহত বিষয়। এ নসীহতের মাধ্যমে আমার মুর্শিদ যেন ছাত্রদের মহামূল্যবান ঈমান হেফাজতের সূক্ষ্ম পদ্ধতির দিকেই পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করলেন। আল্লাহু আকবার! কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি। মানুষের এই অবস্থান তৈরি হয় কেবল নিজকে আল্লাহর সত্তার মাঝে বিলীন করার মাধ্যমে।

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এই সৌভাগ্য এবং যোগ্যতা কোনো শক্তি কিংবা বাহুর জোরে অর্জন করা যায় না। কেবল মহাদাতা রবের করুণা এবং অনুকম্পায় এই যোগ্যতা অর্জিত হয়। একবার এই অধম হযরতওয়ালা (রহ.)-এর কাছে বিনয়ের সাথে জানতে চাইলাম, আপনার দুই সন্তানের মধ্যে কাউকে দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠাননি কেন? প্রত্যুত্তরে হযরত (রহ.) বললেন, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, বৈধ পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যদি দারুল উলূম যেতে পারো তাহলে যাওয়ার পূর্ণ অনুমতি আছে। কিন্তু কোনোক্রমেই অবৈধ পদ্ধতিতে দেওবন্দ যাওয়ার অনুমতি নেই। দারুল উলূমে পড়ালেখা করা বেশির থেকে বেশি নফল হতে পারে। কিন্তু একটি নফল কাজে অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি কোনোক্রমেই দেওয়া যায় না। এটি হযরতওয়ালা (রহ.)-এর অধিক সতর্কতা ও খোদাভীতিরই পরিচায়ক যে, নফল কাজের জন্য তিনি অবৈধ পন্থা অবলম্বনকে অপছন্দ করতেন। হযরতওয়ালা (রহ.) তালীমের পাশাপাশি তারবীয়াতকেও সমান গুরুত্বারোপ করতেন। শিক্ষা-দীক্ষা উভয়টা ছিল তাঁর কাছে সমান। নিম্নের ঘটনাটি আমার এ দাবির পক্ষে জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর নীতি হলো, সেখানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কোনো

ছাত্রের কাছে মোবাইল ফোনসেট পাওয়া গেলে তাকে সাথে সাথে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। হযরতের সামনে এক ছাত্র সম্পর্কে অভিযোগ এল যে তার কাছে মোবাইল ফোনসেট পাওয়া গেছে। হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, তাকে মাদরাসা থেকে বের করে দাও। নির্দেশ মতে ওই ছেলের নাম কেটে দেওয়া হয়। মারকাযের কয়েকজন শিক্ষক ওই ছাত্র সম্পর্কে সুপারিশ করতে এলে হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, ভাই! তালীম সম্পর্কে কিছু শিথিলতা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু তারবীয়াত বা দীক্ষা সম্পর্কে কোনো ধরনের শিথিলতা বা কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। তারবীয়াত সম্পর্কে এই ছিল হযরতের দৃষ্টিভঙ্গি। একবার আমি হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সাথে মসজিদে নববীতে ইতিকাফে ছিলাম। এক ব্যক্তি হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি জন্মগতভাবে বাংলাদেশি হলেও বসবাস করতেন লন্ডনে। তিনি অনেকক্ষণ হযরতের সাথে বসে কথাবার্তা বললেন। যাওয়ার সময় লোকটি হযরতকে কিছু হাদিয়া দিতে চাইলে হযরতওয়ালা (রহ.) এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন যে, আপনার সাথে এটা আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এ জন্য প্রথম সাক্ষাতে হাদিয়া গ্রহণ করাটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং আমি তা গ্রহণ করতে অপারগ। বারবার জোরাজুরি করা সত্ত্বেও যখন হযরত তা গ্রহণ করছিলেন না, তখন ওই লোকটি বললেন, নিজের জন্য না হোক অন্তত পক্ষে মাদরাসার জন্য হলেও কবুল করুন! প্রত্যুত্তরে হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, আমি এখানে চাঁদা করতে আসিনি। চাঁদা দিতে মন চাইলে ঢাকায় গিয়ে মাদরাসায় দিয়ে আসবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ওই টাকা কবুল করেননি। হযরতের অমুখাপেক্ষিতার এই অভাবনীয় দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে আমার পক্ষে বিশ্বাস করাটাই হয়ত কষ্টকর হতো। এই ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা না আমি পূর্বে শুনেছি, না স্বচক্ষে দেখেছি। একবার বাংলাদেশ সফরের সময় বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে অধমের সফরের জন্য উন্নত মানের প্যারাডো জীপের ব্যবস্থা করে দেন হযরত (রহ.)। পথি মধ্যে আমাদের গাড়িটি একটি বাসের সাথে খুব জোরে ধাক্কা খায়। অধমের বাম হাত ভেঙে যায়, আর বাসটিতেও বহু যাত্রী মারাত্মক আহত হয়। সফরসঙ্গীরা আমাকে তৎক্ষণাৎ বগুড়ার একটি নামি হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসা এখনো শুরু হয়নি তখন হঠাৎ হযরতওয়ালা (রহ.)-এর ফোন এল, তাঁকে অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে এসো। কয়েক ঘণ্টার সফর শেষে অস্থিরাবস্থায় আমাকে ঢাকার ব্যয়বহুল ও অভিজাত হাসপাতাল অ্যাপোলোতে ভর্তি করানো হয়। তখন আমি বিভিন্ন সুহৃদের কাছে শুনেছি, হযরতওয়ালা (রহ.) নিজের বড় সাহেবজাদা মুফতী আরশাদ রহমানীকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বাসের সাথে এক্সিডেন্ট হয়েছিল, সে বাসের ড্রাইভার ও হতাহতদেরকে বগুড়ার জামীল মাদরাসায় ডেকে তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও। এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় এবং হতাহতদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এত বড় একটি ঘটনা কেবল হযরতওয়ালা (রহ.)-এর বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সমঝোতার মাধ্যমে মিটে গেল এবং থানা-পুলিশ পর্যন্তও তা গড়ায়নি। আমার চিকিৎসা বাবদ এবং হতাহতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল হযরতওয়ালা (রহ.) তা সম্পূর্ণ নিজের তহবিল থেকেই ব্যয় করেন। এত দূরদর্শিতা এবং উঁচু হিম্মত কোনো আল্লাহওয়ালার পক্ষেই সম্ভব। বর্তমান যুগে ভালো কাজের আদেশদাতা তো অনেকেই রয়েছে। কিন্তু খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারীর সংখ্যা হাতে গোনা। হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন সেই হাতে গোনা ব্যক্তিদের অন্যতম। খারাপ কাজ দেখলেই তিনি গর্জে উঠতেন। যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন, শরীয়তবিরোধী কাজ দেখলে তিনি প্রতিবাদ করতে কখনো তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সারকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা হযরতওয়ালা (রহ.)-কে অসংখ্য উচ্চ গুণাগুণে ভূষিত করেছিলেন। হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন রাত্রি জাগরণকারী বুজুর্গ। কোনো সময় তিনি শেষ রাত্রের তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। হাদীসের ভাষ্য মতে চেহারায় এক ধরনের নূরের ঝিলিক দেখা যেত। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মধ্যে মুমিনসুলভ অসংখ্য গুণের সমাহার ঘটেছিল। প্রত্যেক গুণই আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হযরতের পদাঙ্ক যথাযথভাবে অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। হযরতের অসমাপ্ত মিশন সমাপ্ত করার তাওফিক দান করান। আমীন।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন দ্বীন ও মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরী

মাওলানা আসগার কাসেমী সাহারানপুরী
শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা : দারুল উলূম দেওবন্দ

বাংলাদেশের শরীয়ত ও তরীকতের অবিসংবাদিত ইমাম, ফিকহ-ফাতওয়ার কিংবদন্তি, আধ্যাত্মিক জগতের যুগের জুনাইদ বাগদাদী এবং শিবলী খ্যাত, দেশ এবং উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী, অজস্র মুমিনের নয়নমণি, অসংখ্য অগুনতি উলামা-মাশায়েখের আধ্যাত্মিক রাহবার দ্বীনের স্তম্ভখ্যাত শত-সহস্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও দরদি পৃষ্ঠপোষক, জ্ঞানের আঁতুড়ঘর হিসেবে খ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের গর্বিত সন্তান ফকীহুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) ২০১৫ সালের ১০ নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার এশার সময় নিজের দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ঢাকার প্রাণকেন্দ্র বসুন্ধরার মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রাত-দিনের বিবর্তনে আমাদের কাছে অসংখ্য-অজস্র সংবাদ আসে যে অমুকের মৃত্যু হয়েছে। অমুক রোড এক্সিডেন্টে নিহত হয়েছে। অনেকের মৃত্যু হয় এত করুণ অবস্থায় যে, তার মৃত্যুতে একজন শোক প্রকাশকারীও পাওয়া যায় না, অনেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আরো সঙ্গীন অবস্থায়, প্রবাসে এবং দূর দেশে তার আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরাও তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।! কিন্তু কিছু মানুষ এমন আছে, যাদের মৃত্যুতে হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, যাদের সম্পর্কেই হয়তো এ প্রবাদ বাক্যটি موت العالم موت العالم একজন আলিমের মৃত্যু একটি জগতের মৃত্যু সমতুল্য। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর মৃত্যুও নিঃসন্দেহে সে ধরনেরই হৃদয়বিদারক ঘটনা, যার ফলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা, নীতি-নৈতিকতা ও নিষ্ঠা-সততার ময়দানে এমন শূন্যতা সৃষ্টি হবে, আলোকিত মানব দুর্ভিক্ষের এই মহাক্রান্তিকালে নিকটভবিতব্যে যে শূন্যতা পূরণের আশা করাটা চরম বাতুলতা বলে পরিগণিত হবে। হযরতের মৃত্যুর অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদ আমাদের জন্য বজ্রনাদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। হযরতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের পবিত্র ধারা আমৃত্যু অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর পরিবারবর্গ ও হযরতের ভক্ত-অনুরক্তদের উদ্দেশে হাদীসের ভাষায় বলব–

ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شئ عنده باجل مسمى وانا بفراقك يا ابراهيم (ياعبد الرحمن) محزونون

অর্থ : আল্লাহর সম্পদ আল্লাহই নিয়ে নিয়েছেন এবং যা আমাদেরকে দিয়েছেন সেটার কর্তৃত্বও তাঁরই। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুর সময়সীমা আছে। হে ইবরাহীম (আমি বলছি, হে আব্দুর রহমান) তোমার বিরহে আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ আঘাত সহ্য করার মতো শক্তি দান করুন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) ছিলেন দেওবন্দের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের গর্বিত সন্তান যখন দেওবন্দের আকাশ-বাতাস দিবসে কা-লাল্লাহু-কা-লার রাসূলের শব্দে প্রকম্পিত হতো আর রজনীতে আলোকিত মানবাত্মাদের ইল্লাল্লাহর জিকিরের আওয়াজে উদাসীন মানব হৃদয়েও খোদাপ্রেমের ঢেউ উঠত। প্রহরী থেকে নিয়ে প্রধান মুহতামিম সবার সম্পর্ক ছিল আরশে আজীমের মালিকের সাথে। এমন নূরানী পরিবেশে পেয়েও তিনি কি পেছনে পড়ে থাকবেন? অসম্ভব! তিনি এ পরিবেশ থেকে ভরপুর উপকৃত হলেন। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) হাদীসের কোন কিতাব কোন মনীষীর কাছে পড়েছিলেন, এর একটি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো। বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মদনী (রহ.), আবু দাউদ শরীফ ও শামায়েল-শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলী (রহ.), মুসলিম শরীফ আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী (রহ.), তহাবী শরীফ মুফতী সৈয়দ মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী (রহ.), নাসায়ী, মুয়াত্তা মুহাম্মদ মাওলানা সৈয়দ ফখরুল হাসান (রহ.), ইবনে মাজাহ ও মুয়াত্তা মালেক মাওলানা জহর আহমদ (রহ.), বাহ্যিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতেও তিনি ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। এময়দানে

তিনি ছিলেন থানভী কাননের সর্বশেষ পুষ্প শাহ আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি। বাহ্যিক এবং আধাত্মিক উভয় জগতে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পর বিভিন্ন জায়গায় পাঠদানের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন। অল্প সময়েই তাঁর চমৎকার পাঠদান পদ্ধতি ছাত্রদের মাঝে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। হযরতওয়ালা (রহ.) মিজান থেকে নিয়ে বুখারী শরীফ পর্যন্ত প্রায় সব কিতাবের পাঠদান করেছেন। তিনি আনুমানিক অর্ধ শতাব্দী ধরে বুখারী শরীফের দরস দিয়ে আসছিলেন। আজকের বাংলাদেশ তখন অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তান নামেই পরিচিত ছিল। তিনি নিজের মাতৃভূমিতে অনেক মাদরাসা ও জামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এবং আমৃত্যু সেগুলোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান নির্বাহীর গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। সুন্নাতের অনুসরণ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কাউকেই পরোয়া করতেন না। সুন্নাতবিরোধী কাজ দেখলেই তিনি গর্জে উঠতেন। অপরিচিত ব্যক্তি থেকে তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। তাঁর আলেমসুলভ আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবাদতুল্য। চাঁদা নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো সে আত্মমর্যাদাবোধে সামান্যতমও আঁচড় লাগতে দেননি। তিনি স্বল্পভাষী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মুখে সদা সুচকি হাসি লেগেই থাকত। আগত মেহমানদের যথাযথ সম্মান করার ক্ষেত্রে কখনো কার্পণ্য করতেন না। মোটকথা, বাংলাদেশে তাঁর বরকতময় উপস্থিতিই ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমতস্বরূপ। প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ তার সত্তা থেকে উপকৃত হওয়াকে পরম সৌভাগ্য মনে করত। এমনিতেই প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে হারামাইন শরীফাইনের মুহাব্বত ভালোবাসা থাকাটা ঈমানের দাবি! কিন্তু তিনি ছিলেন এ ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। তাঁর অন্তরে হারামাইনের ভালোবাসা ছিল অনির্বচনীয় ও অকল্পনীয়। এটারই বরকত হলো তিনি আনুমানিক ষাট বারের চেয়ে বেশি হারামাইনের জিয়ারত করেছেন। সুবহানাল্লাহ মদীনা শরীফকে তিনি কী পরিমাণ ভালোবাসতেন তা কলমে প্রকাশ করা অসম্ভব। সে জন্য তিনি প্রায় প্রতিবছর রমাজানুল মুবারকের শেষ দশ দিন মসজিদে নববীতে ইতিকাফে বসতেন। কত অজস্র রজনী বিনিদ্রা যাপন করে তিনি নিজের আমলনামাকে ঋদ্ধ করেছেন, তা রব্বে কা'বাই জানেন। এগুলোর সাথে সাথে তিনি দীর্ঘ হায়াতও পেয়েছেন। হাদীসের ভাষ্য মতে যা তাঁর আমলনামাকে সুশোভিত করতে সহায়তা করেছে। তাঁর আরো একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদ-মক্তব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি স্বীয় ঔরশজাত আত্মজদের শিক্ষা-দীক্ষায়ও কোনো ধরনের কার্পণ্য করেননি। প্রতিনিয়ত তাঁরা যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান হিসেবে সমাজে নিজেদেরকে প্রমাণ করে যাচ্ছেন। এটা তাঁর জন্য স্বতন্ত্র সদকায়ে জারিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীসের ভাষ্য মতে, হযরতওয়ালা (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা যায়, যা স্বর্ণায়নে স্বতন্ত্র পেল্লাই সাইজের গ্রন্থ দরকার। হযরতের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত আছেন, উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁদের স্কন্ধে এই গুরুদায়িত্ব বর্তায় যে, তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব হযরতওয়ালা (রহ.)-এর জীবনের প্রতিটি দিকের ওপর আলোকপাতকরত একটি বৃহৎ কলেবরের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হবে।

দয়াময় প্রভুর সমীপে আমার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহারকরত তাঁকে নিজের সম্মানিত মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন। তিনি নিঃসন্দেহে ওই সব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদের সম্পর্কে কোরআনী ভাষ্য নিম্নরূপ–

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى

অর্থ : হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। (সূরা আল ফজর ২৭-৩০)

আল্লামা ডক্টর ইকবাল মরহুমের ভাষায় বলি–

آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

অর্থ : আকাশ যেন তোমার সমাধিতে শিশির করে বর্ষণ, সেই ঘরের যেন যতন করে চিরকাল সবুজের আবরণ।

বিন্যাস ও অনুবাদ :
মুফতী রিদওয়ানুল কাদির
জামিয়াতুর আবরার, বসুন্ধরা রিভারভিউ, ঢাকা।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন একজন বহুমুখী জ্ঞান ও গুণের অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব

মুফতী ছাঈদ আহমদ

نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وأصحابه أجمعين أمابعد !

অত্যন্ত হৃদয়বিদারক খবর হলো, গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ ইং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আমার প্রাণপ্রিয় মুহতারাম উস্তাদ ফকীহুল মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (রহ.) মাহবুবে হাকীকি রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইলম ও ইরফানের পিপাসুকদের ইয়াতিম করে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। বিবেকবানদের দৃষ্টিতে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়ার আশা করা যায় না। তবে অসীম কুদরতের মালিক মৃত গাছেও ফুল ফোটাতে পারেন, তা ভিন্ন কথা। প্রায় চার মাস পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখছিলাম একজন লোক কিছু গরম পানি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আর বলেছেন, হযরত মুফতী সাহেব হুজুরকে গোসল দেওয়ার জন্য এ পানি আনা হয়েছে। আমি বললাম, মুফতী সাহেব হুজুর আমার উস্তাদ তাই তাঁকে গোসল দিতে আমিও শরীক হব। এ কথা বলতে না বলতেই উস্তাদজি ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) সুন্দর আকর্ষণীয় সুরতে উপস্থিত হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে গোসল দেওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে ছিলাম; কিন্তু উস্তাদজি হঠাৎ একটি পর্দার ভেতর ঢুকে গেলেন। আর আমাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি চলে যাও। পানিওয়ালা ব্যক্তিকেও আর দেখলাম না। জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আমার মনে জোর ধারণা হয়েছিল যে, উস্তাদজি আমাদের ছেড়ে মৃত্যুর পর্দায় ঢুকে যাবেন। এ স্বপ্ন বসুন্ধরার জনাব মুফতী মুঈনুদ্দীন সাহেব এবং জনাব মুফতী ইউসুফ কাসেমী সাহেবকে জানিয়েছিলাম। শুনেছি তাঁরা আমার উক্ত স্বপ্ন উস্তাদজির সামনে আলোচনা করেছিলেন। তিনি তাঁদের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। তার উল্লিখিত স্বপ্নের অর্থ হয়তো আমার রোগের পরিবর্তন তথা শেফাও হতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহপাক যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।

উস্তাদজির অনেক মহৎ গুণাবলি ছিল, যা অন্য আলেমদের মধ্যে প্রায় বিরল। তাহলো তিনি ছিলেন হকের ব্যাপারে কঠোর ও আপসহীন। অন্যদিকে তাঁকে দেখেছি যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তব হককথা তাঁর নলেজে ঢুকাতে সক্ষম হতেন সাথে সাথে তিনি হকের সামনে নতজানু হয়ে তা মেনে নিতেন। যদিও তা তাঁর মেজাজবিরোধী হতো।

আমি ছাত্রজীবন থেকে দেখেছি, তিনি ছাত্রদের প্রতি ছিলেন দয়ালু। তাদের আবদার রক্ষা করার ব্যাপারে ছিলেন অন্যতম শফিক উস্তাদ। যেমন–আমি পটিয়া মাদরাসায় ফুনুনাতে আলিয়া তথা উচ্চতর বিজ্ঞান অধ্যয়নের বছর অন্যান্য কিতাবের সাথে একটি কঠিন কিতাব "মোল্লা জালাল" পড়ার মনস্ত করি। কিন্তু সে কিতাব পড়ার জন্য আমার সাথে অন্য কোনো সাথি ছিল না। আর উস্তাদগণের ঘণ্টাও খালি ছিল না। আমি হযরতের নিকট মনের বাসনা প্রকাশ করি। তাঁর সময় না থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজি হয়ে যান এবং বলেন, তুমি গোসলের ঘণ্টায় আমার নিকট পড়তে আসিও। আমি তা পড়িয়ে দেব। সারা বছর এক শাগরিদ এক উস্তাদ হিসেবে তিনি কিতাবটি পড়িয়েছেন আনন্দের সাথে। কখনো বিরক্তবোধ করেননি। আর এই কিতাব পড়ার ব্যাপারে দেওবন্দে তাঁর একটি স্মরণীয় ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। দেওবন্দে যে উস্তাদের নিকট কিতাবটি পড়েছেন তাঁর কথা ছিল অস্পষ্ট, ভালো করে বোঝা যেত না। তাই ছাত্ররা অন্য উস্তাদের নিকট কিতাবটি পড়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন। তাতে সকল ছাত্র দস্তখত দিল; কিন্তু উস্তাদজি মুফতী সাহেব (রহ.) দস্তখত দিতে রাজি হননি। কারণ তাতে উস্তাদের মনে কষ্ট যাবে, বেয়াদবি হয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে বললেন, তাঁর কথা ভালোভাবে না বুঝলেও তাঁর কাছে কিতাবটি পড়ব।

তাঁর নিকট পটিয়া মাদরাসাতে তাফসীরে জালালাইন প্রথম খণ্ড, হেদায়া রাবে'আ পড়ারও আল্লাহপাক আমাকে তাওফীক দিয়েছেন। তিনি তাফসীরে জালালাইন অভিনব পদ্ধতিতে মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পূর্বের ও পরের আয়াতের মধ্যে যোগসূত্র এবং আয়াতের মর্মবেদ, ভ্রান্ত লোকদের কোরআনের অপব্যাখ্যা ইত্যাদি বিস্তারিত যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করতেন। হেদায়া রাবে'আ অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে তিনি যুগের প্রথমসারির ফকীহ ও মুফতীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইলমের প্রতিটি শাখায় যেমন–কোরআন, হাদীস, ফিকহ,

আরবী সাহিত্য, মানতেক-হিকমত (যুক্তিবিদ্যা) ও আরবী বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ও বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। আকাবেরে দেওবন্দের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ওপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা ও ভক্তি। নিজের জীবনকে তাঁদের রঙে রঙিন করেন। তা প্রচার ও প্রসারে পুরো জীবন ব্যয় করেন। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো একটানা ২৭ বছর অনেক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তাঁর তত্ত্বাবধানে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গাতে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দ্বীনের ঝাণ্ডাবাহী কৃতী সন্তানদের বিশেষ করে আওলাদে রাসূল সাইয়্যেদ আস'আদ মাদানী (রহ.) ও সাইয়্যেদ মাওলানা আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব (রহ.)-এর উপস্থিতিতে মাহফিল পরিচালনা করার কারণে হাজার হাজার মানুষ সহীহ আকীদা ও সত্যের পথে আসার সুযোগ হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ পাপাচার থেকে তাওবা করে নেক আমল করার প্রেরণা পেয়েছে।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) সব সময় অসহায়দের পাশে দাঁড়াতেন, তাদেরকে কথা, কাজে ও আর্থিকভাবে এবং অন্যদের মাধ্যমে হলেও সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। বিশেষ করে গরিব, অসহায় আলেমদের জন্য তাঁর হস্ত সর্বদা প্রসারিত থাকত। তার শত শত নজির রয়েছে। আমি ২০১০ সালে বিভিন্ন কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হই। রোগ বৃদ্ধি পেয়ে আমার অবস্থা এমন হয় যে আমি ২ মাস ৮ দিন বিছানায় শয়ন করতে পারিনি। রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা চেয়ারে বসে থাকতাম। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আমি ভারতের মাদ্রাজ যাওয়ার চেষ্টা করি; কিন্তু ভিসা পাইনি। আমার উস্তাদজি মুফতী সাহেব হুজুরকে সব কিছু বিস্তারিত জানাই এবং অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাই। তিনি বললেন, ভালো ডাক্তার আছে কি না, ভালো করে তা জেনে তোমাকে বলব। তিনি বিস্তারিত অবগত হয়ে আমাকে মোবাইলে জানালেন তুমি বসুন্ধরা মাদরাসায় চলে আসো। অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা হবে। আমি ঢাকার বসুন্ধরা মাদরাসায় গিয়ে এক দিন অবস্থান করি। তিনি হাসপাতালে ভর্তির সার্বিক ব্যবস্থা করেন। বসুন্ধরা মাদরাসায় অবস্থানকালে আমার চাহিদা ও রুচি মোতাবেক খানাপিনা ও নাস্তার ব্যবস্থা করার জন্য মাদরাসার বোর্ডিং সুপারকে নির্দেশ দেন। আমার সাথিদেরকেও ভালোভাবে মেহমানদারি করেন। হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় আমাকে দেখার জন্য আমার আত্মীয়স্বজন ও মহাব্বতওয়ালারা ঢাকা ও বিভিন্ন জেলা থেকেও আসতেন। উস্তাদজি মাদরাসার দায়িত্বশীলদের বলে দিয়েছেন, মুফতী ছাঈদ আহমদকে দেখার জন্য যারা আসে তাদের থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা এখানে হবে। কারণ হাসপাতালে একজনের বেশি লোক থাকার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হাসপাতালে ভর্তির দুই দিন পর আল্লাহপাক আমাকে বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন জটিল রোগ ভোগ করা সত্ত্বেও আল্লাহপাক এ পর্যন্ত বিছানায় শোয়ার তাওফিক দান করেছেন। এ ব্যাপারে উস্তাদজির অবদান অনস্বীকার্য। আমি বিছানায় শয়ন করতে পারছি শুনে উস্তাদজি খুব খুশি হন। অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে আসার সময় দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হন। হাসির ঝলক তাঁর চেহারায় প্রকাশ পায়। কোনো পিতা নিজের ছেলে কঠিন মুসিবত থেকে মুক্তি পেলে যে ধরনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, ঠিক সে রকম আনন্দের আভা তাঁর অবয়বে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। তিনি আমাকে বলেন, এখন তো সফর করতে পারবে না। যাও, বসে বসে হাদীসের খেদমত করো। উস্তাদজি আমাকে দেখার জন্য পরে একবার লালপোল মাদরাসায় তাশরিফ আনেন এবং কিছু টাকাও দেন।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) তরীকতের মুরব্বি এবং নিজের উস্তাদগণের কথা-কাজ, ইশারা-ইঙ্গিতের খুব মূল্যায়ন করতেন। তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। শায়খুল আরব ওয়াল আজম, কুতবুল আলম হযরত শাহ সোলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-কে একবার বসুন্ধরা মাদরাসায় দু'আর জন্য নিয়ে যান। নানুপুরী হুজুর মুফতী সাহেব (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কী কী বিষয়ের দরস দাও? মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) বললেন, আমরা এখানে দারুল ইফতা খুলেছি। নানুপুরী হুজুর (রহ.) বললেন, দারুল ইফতার ছাত্র কোথা থেকে আসবে এর অপেক্ষায় থাকতে হবে; বরং নিজেরাই ছাত্র তৈরি করেন। এখানে দাওরায়ে হাদীস ও মিশকাত জামা'আত পড়ানো শুরু করেন। নানুপুরী হুজুর (রহ.)-এর ইশারায় বসুন্ধরা মারকাযে পরের বছরে দাওরায়ে হাদীস পাঠদান আরম্ভ করেন তিনি।

আমি নানুপুর মাদরাসায় শিক্ষা পরিচালক থাকাবস্থায় কতিপয় অপরিচিত মানুষ মাদরাসায় এসে বলে, আমরা হরকাতুল জিহাদের লোক। তারা ছাত্রদের সামনে বয়ান করার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দেইনি। পরে তারা

আমার কামরায় এসে আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেয়। আমি তাদেরকে স্পষ্ট বলে দেই, মুসলমানরা তাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা তাদের ইলম, আমল ও আখলাক শিক্ষা দিই। আপনারা এসেছেন জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে এবং জিহাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার গুরুত্ব আলোচনা করতে। আমরা ছাত্রদেরকে কিতাবুল জিহাদ পড়াই। জিহাদ কত প্রকার ও কী কী? কিভাবে আত্মার সাথে জিহাদ করতে হবে? জালেমের সামনে হক কথা বলে জিহাদ করতে হবে, কখন বাতিলের বিরুদ্ধে কলমের জিহাদ করতে হবে।

মোদ্দাকথা, আত্মার সাথে জিহাদ, মুখের জিহাদ, কলমের জিহাদ ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিহাদের ব্যাপারে আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিই। আপনারা শুধু অস্ত্রের জিহাদের কথা বলেন। অস্ত্রের জিহাদের জন্য যখন সরকারের পক্ষ থেকে ডাক আসবে, তখন আমাদের ছেলেরা অস্ত্রের জিহাদের জন্য তৈরি হবে। এখন বাংলাদেশে অস্ত্রের জিহাদের প্রয়োজন নেই। এখন এ ব্যাপারে আপনারা বাড়াবাড়ি করবেন না। তারা আমার ওপর রাগ করে চলে যায়। আমার উস্তাদজি মুফতী সাহেব হুজুর তখন নানুপুর মাদরাসায় বুখারী শরীফের দরস দিতেন। তিনি এই ঘটনা শুনে খুশি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তাদের ব্যাপারে কওমী মাদরাসার জিম্মাদার ও উস্তাদদের সতর্ক হওয়া খুব প্রয়োজন। কারণ তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কওমী মাদরাসাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবে। উস্তাদজির এই দূরদৃষ্টি পরবর্তীতে সকলের সম্মুখে বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) বিনয়গুণে ভূষিত ছিলেন। মুহাক্কিক মুফতী ও আলেম হওয়া সত্ত্বেও নিজের ছাত্রদের সাথে ইলমী আলোচনা ও কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে সংকোচবোধ করতেন না; বরং কোনো বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে নিজের ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে তা নিরসন করতেন। তার অনেক নজির রয়েছে। আমি হুজুরের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার ফাতওয়ার ব্যাপারে হুজুরের ছিল গভীর আস্থা। নানুপুর মাদরাসায় হুজুর আমাকে বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন। কখনও আমি উপস্থিত জবাব দিতাম, আর কখনও আমি কিতাব দেখে জবাব দিতাম। একবার হুজুরের চোখে মোসুমি রোগ দেখা দিয়েছিল। চোখ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। আর তিনি হাত রুমাল দিয়ে বারবার চোখ মুছতে ছিলেন। আমি বললাম, কেন বারবার চোখ মুছতেছেন? তিনি বললেন, তা নাপাক পানি। আমি বললাম, আমার তাহকীক মতে তা নাপাক নয়। শামী ইত্যাদি কিতাব খুলে তাঁকে তা দেখালাম। দেখে সাথে সাথে তা মেনে নিলেন এবং খুশি হলেন।

হুজুরের শাইখ, মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)

মাদরাসার কালেকশনের ব্যাপারে তাঁকে জাওয়াব লেখার নির্দেশ দেন। তিনি ইস্তেফতা আকারে উর্দূ ভাষায় প্রশ্ন লিখে আমাকে হুকুম করেন তার উত্তর লেখার জন্য। আর বলেন, এটা হারদূয়ী হযরতের প্রশ্ন, উত্তর ভালো করে লিখিও। আমি উত্তর লিখলাম। তিনি ওই বছর হজে যাওয়ার সময় তা সাথে নিয়ে যান এবং হযরত শাইখকে মদীনা শরীফ সাক্ষাতে তা দেখান। তা দেখে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ওই বছর নানুপুর মাদরাসা থেকে 'আর-রশীদ' মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম সংখ্যায় বরকতের জন্য মাসআলা বিভাগের প্রশ্ন উত্তরের প্রথমে বাংলা ভাষায় তরজমা করে তা প্রকাশ করা হয়।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) দ্বীনের কাজে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং হিম্মত বৃদ্ধি করতেন। নানুপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আর-রশীদ' পত্রিকার আমি সম্পাদক ছিলাম। মাসআলা বিভাগের প্রায় প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি নিজেই দিতাম। প্রতি সংখ্যায় কমপক্ষে ৪০টি প্রশ্নের উত্তর লিখা হতো। মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) প্রতি সংখ্যার মাসআলাগুলোর উত্তর এবং যেগুলো সঠিক ও যথাযথ জাওয়াব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করতেন এবং খুশি জাহের করতেন। তাতে আমার হিম্মত বৃদ্ধি পেত।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন ইসলামী অর্থনীতিব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে অগ্রণীয় ভূমিকা রাখনেওয়ালা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই কারণেই তাঁকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সম্মিলিত শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছিল। কিভাবে বাংলাদেশে সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা চালু করা যায়, সে ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একদল আলেমকে এই ব্যাপারে তৈরি করার জন্য তিনি বসুন্ধরা ইসলামী রিসার্চ সেন্টারে ইসলামী অর্থনীতি বিভাগ চালু করেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণী। দেশের বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য তিনি জোরালো প্রচেষ্টা চালান। কওমী মাদরাসার শিক্ষা উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই জন্যই তাঁকে শিক্ষার মান উন্নয়নে চারটি কওমী মাদরাসা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমী মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক (রহ.)-এর হাতে বাইআত হওয়ার পর তাঁর জীবনে এক অকল্পনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রকে তিনি সুন্নাতের রঙে রঙিন করেন এবং ইবাদতের প্রতি খুব বেশি মনোনিবেশ করেন।

নিজেও আমলের পাবন্দ ছিলেন এবং অন্যদেরকেও আমলের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর হাতে বাইআত হওয়ার পর একবার নানুপুর মাদরাসায় আমাকে একান্তে বলেন, মুফতী সাহেব! যখন শরীরে শক্তি ছিল, তখন আমলের দিকে এত মনোযোগ দিইনি; কিন্তু এখন আমলের দিকে মন ঝুঁকছে; কিন্তু শরীরে শক্তি নেই। অত্যন্ত আফসোসের মাধ্যমে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে মনের ব্যথা ব্যক্ত করেন।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) তরীকতের ময়দানে ছিলেন প্রশস্ত দিলের অধিকারী। তিনি তাঁর কোনো কোনো মুরীদকে বলতেন, এখানে আসা-যাওয়া অসুবিধা হলে নিজের আশপাশে কোনো হক্কানী শাইখে তরীকত থাকলে তাঁর সোহবতে গিয়ে ফায়দা হাসিল করিও এবং আত্মশুদ্ধির কাজে তরক্কি করার চেষ্টা করিও। এ মর্মে হুজুরের কিছু বড় আলেম মুরীদ তাঁর জীবদ্দশায় আমি অধমের নিকট ইসলাহের নিয়্যাতে আসা-যাওয়া করত। আর এখনো করে।

মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) শুধু বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মুফতী ছিলেন না; বরং দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা মুফতী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, দেওবন্দ ও অন্যান্য অনেক জায়গায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিকহী সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে ওইগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯১ সালে ভারতের দেওবন্দে অবস্থিত মাহমুদ হলে জমিয়তে উলামার পক্ষ থেকে দুবার আন্তর্জাতিক ফিকহী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল, 'মুসলিম ফান্ড', দ্বিতীয় সেমিনারের বিষয় ছিলো, 'নেযামে ক্বাযা'। উভয় সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে চারজন মুফতী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উস্তাদজি ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন এবং আমি অধমও ছিলাম। হুজুর তাঁর লিখিত প্রবন্ধের খুলাছা অর্থাৎ মূল বিষয় ১০ মিনিটের মধ্যে খুব সুন্দর আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। তাঁর উপস্থাপনা থেকে সেমিনার পরিচালক ও উপস্থিত আমন্ত্রিত বড় বড় মুফতীয়ানে কেরাম বিমোহিত হন। ফিকহে তাঁর জ্ঞান ও পারদর্শিতা সকলের নিকট সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমি ভারত ও পাকিস্তানে পড়ার সুযোগ পাইনি এবং কোনো উর্দূওয়ালা হযরতের হাতে বাইআত হওয়ার ও তাঁর সোহবত গ্রহণ করারও সুযোগ হয়নি। যার কারণে উর্দূভাষীদের থেকে উর্দূ ভাষা শেখা ও বলার সুযোগ হয়নি। ফিকহী সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া মহাদেশের খ্যাতনামা ও বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরাম এবং দেওবন্দের মাশায়িখে কেরাম, মুফতীয়ানে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ। দর্শক ও শ্রোতা ছিল দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক এবং অন্যান্য দেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আলেম ও তালিবে ইলমগণ। সেমিনারের এই দৃশ্য দেখে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, আমি এখানে বক্তব্য পেশ করব না। উস্তাদজিকে আমার মনের কথা ব্যক্ত করি। তিনি ছিলেন সাহসী। অন্যদের সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি করতেন। উস্তাদজি বলেন, সেমিনার কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন লিখে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তুমি উত্তর লিখেছ। তা দেখে তাঁরা খুশি হয়ে তোমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। এখন তুমি বক্তব্য রাখতে কী অসুবিধা? তুমি তাযকীর-তানীছের (উর্দূ ভাষায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবধানে) ভয় করছো নিশ্চয়। তুমি দেখবে বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় অনেক মুফতীয়ানে কেরামের বক্তব্যে তাযকীর-তানীসের পাত্তা নেই। তুমি ভয় করিও না। পুরো প্রবন্ধ পাঠ করার চেষ্টা করিও না; বরং প্রবন্ধের মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করিও। আল-হামদুলিল্লাহ! উস্তাদজির কথায় আমার মন থেকে সব ধরনের ভীতি দূর হয়ে যায়। আমি তাঁর কথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে প্রবন্ধের মূল বিষয় আলোচনা করি। আল্লাহর শোকর উভয় সেমিনারে আমার ও উস্তাদজির প্রবন্ধ জমহুরের মতের সাথে তথা-সেমিনার পরিচালকদের নিকট যাদের ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য হয় তাঁদের মোতাবেক হয়েছে।

উস্তাদজি ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর গুণাবলি যা আমার জানা আছে, তা লিখলে বড় একটি কিতাব হয়ে যাবে। সংক্ষেপে কিছু গুণাবলি তুলে ধরলাম। পরিশেষে আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করি, আল্লাহ পাক হুজুরকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান দান করুন এবং তাঁর পরিবার, ছাত্র, মুরিদ ও খলিফাদেরকে তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার ওপর অটল অবিচল রাখেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো আল্লাহ পাক হেফাজত করেন এবং দিনদিন তরক্কী দান করেন। তাঁর বংশধর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হক্কানী আলেমের সিলসিলা জারি রাখেন। আমীন!

লেখক : মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া সোলতানিয়া, লালপোল, ফেনী।

বের হয়েছে **বের হয়েছে** **বের হয়েছে**

প্রাপ্তিস্থান :

মারকাযুল ফিকরিল
ইসলামী বাংলাদেশ,
বসুন্ধরা, ঢাকা।
০১৯৮১৬১৯৭৭৯

জামিয়া ইসলামিয়া
কাসেমুল উলূম (জামিল
মাদরাসা) বগুড়া।
০১৭১৮৪০৭২৭৮

জামিয়া মাদানিয়া
শুলকবহর, চট্টগ্রাম।
০১৮১৭৭৫০৩৯৮

জামিয়া ইসলামিয়া
মাইজদী, নোয়াখালী।
০১৯২৬০১৮৬২৭

জামিয়া ইসলামিয়া
টেকনাফ, কক্সবাজার।
০১৮১৭০০৯৩৮৩

জামিয়া করিমিয়া
জুম্মাপাড়া, রংপুর।
০১৭১৫৩৬১২৪২

ইসলামিক রিসার্চ
সেন্টার কক্সবাজার।
০১৮১৬০০০৮১০

সৌজন্যে

রয়েল এয়ার সার্ভিস সিস্টেম
শামা কমপ্লেক্স, ৬৬/এ নয়া পল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।
০২-৯৩৬১৭৭৭

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
০৩১-৬৩৪৯০৫